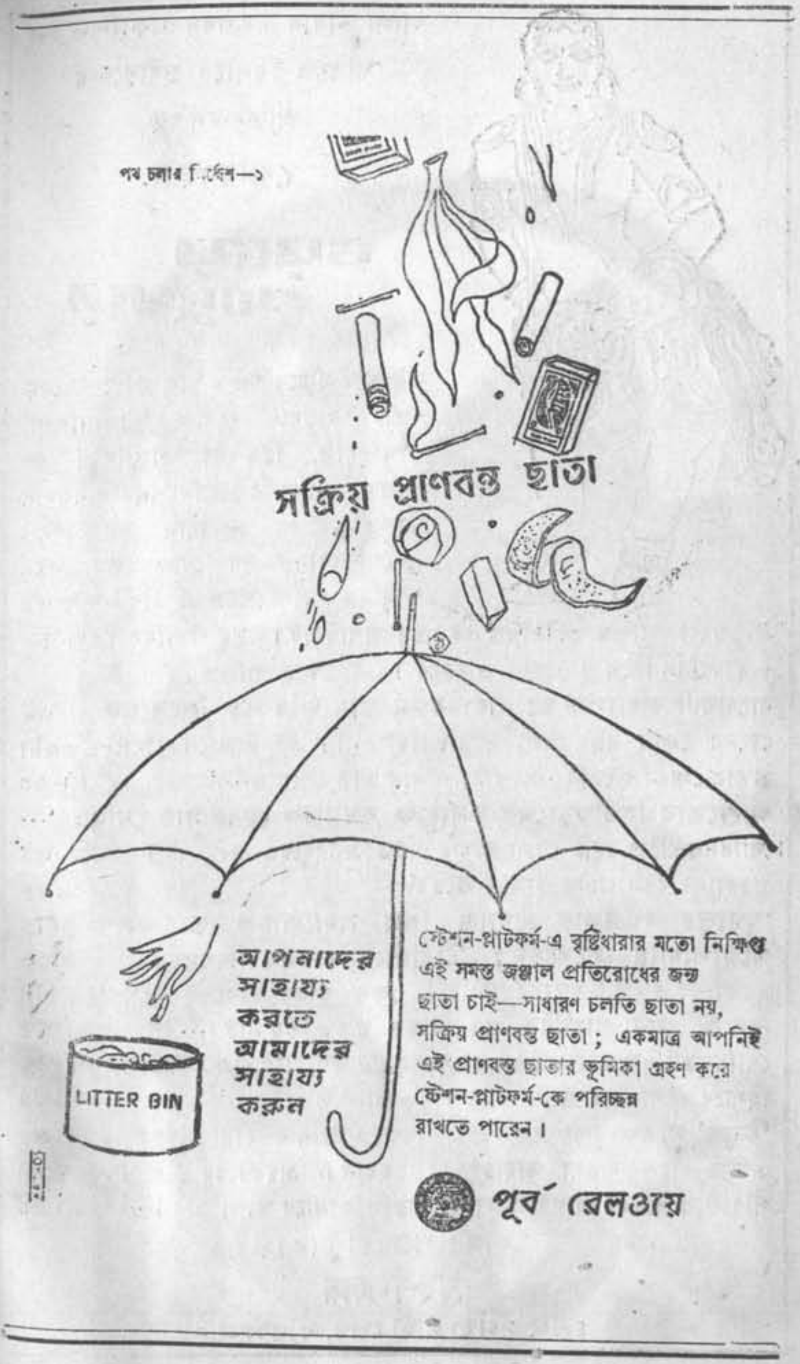



ব

১৩৭০


পথ চলার নির্দেশ—১
সক্রিয় প্রাণবন্ত ছাতা
LITTER BIN
আপনাদের সাহায্য করতে আমাদের সাহায্য করুন
স্টেশন-প্লাটফর্ম-এ বৃষ্টিধারার মতো নিক্ষিপ্ত এই সমস্ত জঞ্জাল প্রতিরোধের জন্য ছাতা চাই—সাধারণ চলতি ছাতা নয়, সক্রিয় প্রাণবন্ত ছাতা ; একমাত্র আপনিই এই প্রাণবন্ত ছাতার ভূমিকা গ্রহণ করে স্টেশন-প্লাটফর্ম-কে পরিচ্ছন্ন রাখতে পারেন।
পূর্ব রেলওয়ে

পরিচয়

বর্ষ ৩৩ । সংখ্যা ৭
মাঘ, ১৩৭০


## সূচীপত্র




প্রচ্ছদ—কানু বসু

সম্পাদক
গোপাল হালদার ॥ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

পরিচয় (প্রা) লিঃ-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু


# কথাপ্রসঙ্গে

কথার পরে পরে কতকগুলো কথা মনে হচ্ছে। একটা হচ্ছে এই যে, আমার বন্ধু নির্মলকুমার (বসু) বললেন, "আমাদের দেশে আমাদের যাঁরা ধর্মস্রষ্টা কিংবা ঋষি মন্ত্রদ্রষ্টা এসব কথা অনেক আগেই বলে এসেছেন, তাঁরা দুঃখকে ভালো করেই বুঝতেন।"

আমরা যখন ইস্কুলের ছাত্র তখন আমাদের মধ্যে নানা রকমের লোক ছিল। একজন একদিন হঠাৎ নিয়ে এল সাংখ্যের বই। তার প্রথম কথা রয়েছে মানুষের যত রকম দুঃখ তার নিবারণ করার চেষ্টা হচ্ছে মানুষের প্রধান কর্তব্য। অবশ্য ঐতিহাসিকরা বিবেচনা করবেন বুদ্ধদেব আগে বলেছিলেন কি তারা আগে বলেছিলেন। ওসব কথা ছেড়ে দিলে বিজ্ঞানের যে কথাটা সেটা হচ্ছে এই যে, ঠিক আমাদের ধার্মিকেরা যে ভাবে এর উত্তর দিতে চেয়েছিলেন বিজ্ঞানের উত্তর ঠিক তা নয়। বুদ্ধদেব যখন কিসা গৌতমীকে বললেন যে, "যাও তুমি, যার বাড়িতে কেউ মরে নি সেখান থেকে নিয়ে এস সর্ষে, তাহলে আমি তোমার ছেলেকে বাঁচিয়ে দিচ্ছি"—এটা সহানুভূতির চূড়ান্ত হতে পারে, মানুষকে অন্তর্দৃষ্টি দিতে পারে; কিন্তু তার সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর ইংলণ্ডের মনোভাব একটু আপনারা বিচার করে দেখুন। হঠাৎ কয়েকটা লোক বসন্তে মারা গেল। তাদের বাঁচাবার কথা হল না কিন্তু লক্ষ লক্ষ লোকের সামনে যে এরকম বিপদপাত হল তার জন্য তাদের একথা বলে সান্ত্বনা দিলে না যে এটা ভগবানের মার। বরঞ্চ তারা মনে করলে যে আমাদের কোথাও একটা ঘাটতি হয়ে গেছে। অতএব এর জন্য তৎপর হতে হবে। মানুষের দুঃখ ভগবান এমন ভাবে

দিয়েছেন যে তাকে যদি বলা যায় সেটা নেই, তাহলে সত্যি সত্যি জগৎ নেই এ কথাই বলতে হবে। এবং সঙ্গে সঙ্গে জগৎ যদি না থাকে তাহলে আমরাও নেই। শেষ অবধি গিয়ে দাঁড়াবে অদ্বৈতবাদে।

আজকে আমি রমণ মহর্ষির বই পড়ছিলাম—তাঁর জীবনী। তাতে দেখা গেল যে ভারতবর্ষেও যে সাধনা মূর্ত হয়ে অরুণাচলে ছিল তার ভেতরে এই ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, যেটা এসব দুঃখে প্রবৃত্ত বৈদেশিকের মনের ভেতরে সাড়া দিয়েছে। কিন্তু শোকে অভিভূত হয়ে সান্ত্বনা পাওয়ার কথা এক, আর লক্ষ্মণের বলিষ্ঠভাবে লাঠি হাতে করে বেরনো, যে মানুষের কে শত্রু আছে তাকে নিপাত করব, এটা দুটো আলাদা। এই মনোভাব মানুষ প্রথম দিন পায় নি—ক্রমশ পেয়েছে—এই বিংশ শতাব্দীর এতদিনের সাধনার ফলে অন্তত এটুকু পেয়েছে বলা যেতে পারে।

আমি সনাতনীদের এই কথাটি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, সব কিছু আমার বন্ধু যেমন বলতেন ঠাট্টা করে যে 'ব্যাদে আছে'; সে—'বেদে আছে' এই মনোভাবটা অনেক সময়তে যদি নিদান করতে হয় তাহলে মাঝে মাঝে শক্ত কথাই বলতে হয়। আমি অবশ্য খুব ভক্তিমান,—আমি বোধ হয় পৃথিবীর মধ্যে সবারই থেকে বেশি শ্রদ্ধা করি বুদ্ধদেবকে। এবং সঙ্গে সঙ্গে বলি, বুদ্ধদেবকে আমরা আড়াই হাজার বৎসর বাদে জয়ন্তী করে দিয়ে,—অন্তত তাঁর প্রতি এত বছর ধরে যে অবিচার করে এসেছি তার কিছু দাম দেবার চেষ্টা করেছি। যদিও তাঁকে আমরা ভগবান করেছি। এ রকম অনেক লোককে,—আমাদের একটা উপায় হচ্ছে তাকে ভগবানের তক্তাতে বসিয়ে দিলেই তার কথা শোনবার আর দরকার নেই। আগেকার কথা আমি বলব না, সম্প্রতি ভারতবর্ষেও অনেক কিছু ঘটে গেছে—যা থেকে আপনাদের সহজেই এসব কথা মনে পড়বে। আজকের দিনেও আপনারা রবীন্দ্রনাথকে পূজা করে তক্তে বসিয়ে দিচ্ছেন। তারপরে রবীন্দ্রনাথের কোনো কথা ভাববার দরকার থাকবে না। আমরা তাঁকে মিউজিয়াম পিসের মধ্যে তুলে নিলাম।

আর আমাদের দেশের কথাতে দু-চারটে কথা মনে হয় যে অন্তত আমরা যারা বিজ্ঞানী, তাদের কতকগুলো কথা মনে রাখতে হবে। একবার পরিহাসচ্ছলে আমাদের দেশের এক নেতা বলেছিলেন আর একজন বিশেষ কোনো নেতার বিষয়ে যিনি সনাতনী। বলেছিলেন, "লোকটি এমন—



সোজা ছুরি যদি তার মধ্যে চালিয়ে দাও তাহলে সেটা cork-screw হয়ে বেরিয়ে আসবে।" আমাদের দেশে লোকের মনোভাব হয়তো এই ধরনের। খুব সোজা সরল সত্যকথা বললে সেটা অনেক সময় কাব্য হয়ে বেরিয়ে আসবে। অদ্ভুত মনোভাব। এইটে আমার বার বার মনে হয় যে আমাদের কথাও যেমন, চলনেও তেমনি এবং বিজ্ঞানেও প্রায় তাই। যে মনোভাব বলিষ্ঠ, যেটা, যাকে বলে কোদালকে কোদাল বলা,—সেটা যেন আমাদের মনেতে বিশেষ নেই। আমাদের সবই কাব্য!—কাব্যমধু খেয়ে আমরা একেবারে এমন মাতোয়ারা হয়ে আছি যে চোখের সামনে আর কিছু দেখি না। অবশ্য আমি বলছি যে, সে হয়তো দেখে যে এই স্রষ্টা পৃথিবীটাকে এত সুন্দর করে তোলেন নি যে তা দেখেই ভুলে যাবে যে তার ভেতরে এত দুঃখ-কষ্ট আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে আমার যেটা আশ্চর্য লাগে সেটা হচ্ছে তাঁর শিশুর মতো মনোভাব। শিশু যখন পৃথিবীতে আসে তখন তার সঙ্গে পরিচয় নেই কিছুরই অথচ সব জিনিসেতে সে আনন্দের আস্বাদ পায়, এই মনোভাব মানুষের হওয়া উচিত বলে আমাদের ও অন্য দেশেরও বহু মহাপুরুষরা বলে গিয়েছেন, যেমন যীশু বলেছেন ছেলেদের আমার কাছে আসতে দাও। শোনা যাচ্ছে অরুণাচলের রমণ ঋষির কাছেও ছেলেরা অনায়াসে চলে যেত। কিন্তু অন্য বহু লোক এসে তাঁর মুখ থেকে কোনো কথাই পেত না। এই শিশুর মনোভাব পরে মানুষের বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চলে গিয়ে পাটোয়ারী বুদ্ধি ইত্যাদি নানান রকম জিনিস তার মধ্যে ঢোকে। সেটাকে এমন একটা অবস্থায় নিয়ে আসে যাতে তার কাছে সত্যও বিকৃত হয়ে দাঁড়ায়।

আমি যা বলছিলাম, সবই প্রায় কাব্য হয়ে যায় অনেক সময়ে। তাই ধর্মধ্বজীরা যখন অনেক সময়েতে বলে যান এবং চোখ দিয়ে অনবরত দুঃখের অশ্রু যখন তাঁর পড়ে তখন আমার মনে হয় যে ঘরের কোণে বসে কেবলমাত্র ভগবানের ওপর দোহাই না পেড়ে এবং মাথা না ঠুকে যদি প্রতীচ্যের লোকেরা বেরিয়ে পড়ে যে মানুষের শত্রুকে আমরা দমন করব তাহলে সেটা কিছু একটা চিরন্তনী সত্যের মধ্যে একটা নিম্নস্তরের মনোভাব এই বলে নিজেদের কিছু বাহবা নেবার কোনো দরকার নেই। কবে আমরা বুঝব যে এই ধরনের মনোভাব, যেটা সেই আদি যুগ থেকে মানুষ বিস্ময়ের চোখে যখন পৃথিবীকে দেখেছে তখন থেকেই তার মনে হয়েছে—হয়তো প্রস্ফুটিত হতে কোনো ভাষাতে দেরি লেগেছে, কোনো ভাষায় হয়তো

প্রথমেই ফুটেছে। কিন্তু এই মনোভাব যে চিরকালই সমস্ত কাজের ভেতরে ওতপ্রোতভাবে দেশের মানুষের মধ্যে ছিল না, যাঁরা একটু খোলা চোখে দেশের ইতিহাস অনুধাবন করবেন তাঁরাই তা বুঝতে পারবেন। যখন আমরা এদিকে সাংখ্যসূত্র পড়ছি তখন আমাদের আর একটা বই সঙ্গে সঙ্গে পকেটে থাকত, সেটা হচ্ছে ম্যাৎসিনির 'On the Duties of Man'। ছাত্ররা বোধ হয় এসব বই কখনো চোখেও দেখে নি। কিন্তু তখন, আমরা যখন ছাত্র ছিলাম, তখন আমাদের মনে অত্যন্ত গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল এই দুই ধর্মের পদ্ধতি যে, একটা হচ্ছে বলিষ্ঠভাবে পৃথিবীকে প্রত্যাখ্যান করা—এর মধ্যে মায়ার প্রপঞ্চ যে সবই এবং নিজের মধ্যে যদি আমরা চলে যাই তাহলে ভাবা যেতে পারে—এই যে দেহ, এ দেহকে যদি ছুরি দিয়ে কাটি, আমাদের গায়ে যদি বিদ্ধ করে দিই বিষাক্ত বাণ, তাহলে ভেতরের আত্মাকে কেউ তো হত্যা করতে পারবে না। খুব ভালো কথা। অতএব যুদ্ধ কর, বাণ এবং অস্ত্রও চালাও, এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বজাতি যা কিছু সবই বধ করে চল। যখন মনে হবে যে তোমাদের সঙ্গে ঠিকমতো না মিলছে, তখন যে বেচারী শূদ্র, যার সাহস হয়েছে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করতে, যার দরুণ পৃথিবীতে দ্বাদশ বৎসর অবৃষ্টি, রাজার উচিত হচ্ছে প্রথমেই তার মুণ্ডচ্ছেদ করা। এসব কথা ভুললে চলবে না কেননা আমরা উপনিষদের বাণী দিয়ে পুষ্ট নই। সত্যিকারের হিন্দুসমাজ পুষ্ট হচ্ছে লোকমুখে নানাভাবে যে পুরাণশাস্ত্র থেকে মানুষের উপভোগ্য যে সমস্ত আখ্যায়িকা দেশের মধ্যে চলিত আছে তারই ওপর। এই বিশ্বাস সব দেশেই ছিল। আমি যে আমার নিজের দেশকে ভালোবাসি না, তা নয়। তবে আমি বলি এই যে ভালোবাসা যদি এমন রূপ নেয় যাতে পদে পদে সত্যের অপলাপ করতে হয়, তাহলে সে ভালোবাসার কোনো দাম নেই। যাকে গ্রহণ করতে হবে, যার প্রতি পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে তার যদি সমস্ত দোষ পর্যন্ত আমি গুণ বলে বর্ণনা করি তাহলে সে কাব্যের জগতেই চলে। মানুষের মধ্যে সেই মনোভাব আনা অত্যন্ত দুষ্কর। হয়তো আজকাল ছেলেদের মধ্যে সে মনোভাব হতে পারে তা আমি জানি না। আর এই যে বিস্ময়—আমরা যে সৃষ্টি করেছি আমরা যা সব গড়ে তুলেছি সেগুলিকে আমরা যেভাবে দেখি হয়তো বিদেশীদের মন সেগুলি সেভাবে নেয় না।

একটা গল্প বলি। বিদেশী একটি লোক এসেছিলেন যিনি চেকো-



স্লোভাকিয়ার, বাটানগরের সঙ্গে বিশেষ করে তাঁর সম্পর্ক ছিল। রবীন্দ্র-উৎসব সম্প্রতি যে সব হচ্ছে তার মধ্যে তিনি ছিলেন। গিয়ে দেখে-টেকে এসে, এমন, তারপরে তার দু-একজন বন্ধুর সঙ্গে এবং যে তাঁকে সমস্ত জিনিস দেখিয়েছে তার সঙ্গে কথা হল। তাকে তিনি বললেন, "দেখ একটা জিনিস আমি দেখলুম, এ আমি আমার দেশের ডিরেক্টারকে না বলেই পারি না। তোমরা যাই বল না কেন, আমায় কিন্তু বলতেই হবে।" সে বেচারী, যে পথপ্রদর্শক হয়ে তাঁর সঙ্গে ঘুরেছিল, সে অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেলো। ভাবল যে কি বা আমার হয়তো একটা দোষ হয়ে গিয়েছে। হয়তো এমন একটা কিছু করলাম, এরকম একজন মহামান্য অতিথি, তাঁকে হয়তো আমরা পুরোপুরি মাত্রায় শ্রদ্ধা দেখাতে পারিনি ; কি হয়েছে, কি বৃত্তান্ত। অনেকবার তাঁকে ধরাধরি করাতে শেষকালে বললে, "দেখ আমার চোখেতে যেটা লাগল সেটা অদ্ভুত জিনিস। এই শান্তিনিকেতনে কেউ জুতো পরে না!"—এই যে বাটার লোক আমাদের সভ্যতাটাকে কি চোখে দেখেছে সেটা তোমরা কিছুটা বুঝতে পারলে। অনেক সময়ে মৌখিক তারিফ হয়তো আমাদের লোককে তারা জানায় কিন্তু মনের মধ্যে হয়তো বলে যে এদের দেশের লোক জুতো পরে না।

এই, তাছাড়া আমাদের বাঙলাভাষায় যে বিজ্ঞানের চর্চা করা উচিত রবীন্দ্রনাথ এতদিন আগে বলে গিয়েছেন তা সত্ত্বেও আমাদের দেশের মন কি নড়াতে পারা গিয়েছে? তোমরাই জানো, আমি তো চিরকাল বেঁচে থাকব না,—অবশ্য আমাকে লোকে বলে ঐ একটি লোক আছে—আর কেউ চায় না, আর রবীন্দ্রনাথ চাইতেন। তিনি তো কবি মানুষ তিনি তো বোঝেন না বৈজ্ঞানিক যে উন্নতি কি সমৃদ্ধি হতে গেলে বিদেশের সঙ্গে যোগ রাখতে হয়। বিদেশের সঙ্গে যোগ রাখা, মানে তার সঙ্গে সঙ্গে সে যে ভাষা বলবে সেই বুলি কাটা এবং যখনই যেটা বলবে পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে যদি আসে তো সেই কথাটাই আবার চুনে নিয়ে আবার সেইগুলো যথাসম্ভব সেই ভাষাতেই উত্তর দেওয়া, এইটি হচ্ছে আমাদের জ্ঞানের সবার থেকে প্রধান—যাকে বলে যে যেটার নিরিখ।

আমাদের দেশে অনেক সময়েতে দেখা যায় এই রকমই ব্যবস্থার এইটাই ফল। আইনস্টাইন একবার বলেছিলেন নিজের দেশে। সেখানেও এইরকম হয়েছিল যে অনেক বিত্তের ভারেতে তাঁকে মুমূর্ষু হয়ে পড়তে হত। এবং

তিনি এক জায়গায় বলেছেন যে, "পরীক্ষা দেবার পর এক বছর লাগল আমাকে এই যা মুখস্থ-টুখস্থ করে পাশ করতে হয়েছে তার থেকে আবার একটা মনোভাব ফিরিয়ে নিয়ে আসতে, যাতে আমি সব বিষয়ে উদ্ভাবনী শক্তিকে সামনে রেখে, উদ্ভাবনী শক্তি অনুসারে তাকে ভাবতে পারি।" তিনি একটা কথা বলেছেন যে, নানান রকম নিয়ম সিলেবাস ইত্যাদির ভিতর দিয়ে ভালো করে বেঁধে প্রতি ঘণ্টায় এই করতে হবে রুটিন রেখে এবং প্রতি বৎসর বৎসর কি প্রতি মাসে পরীক্ষা দিতে হবে—এ রকম করলে আমাদের দেশের যে উদ্ভাবনীশক্তি সেটা ঠিক বেরুবে না। সৃজনীশক্তি চায় স্বাধীনতা। সে স্বাধীনতা এ নয় যে পরীক্ষা-হলে বই নিয়ে গিয়ে উত্তর লেখা—কিংবা মনোমত প্রশ্ন না পেলে খাতাপত্তর ছিঁড়ে দিয়ে উঠে চলে আসা। এটা ঠিক নয়। তিনি ভেবেছিলেন যে মানুষকে বিশ্বাস করতে হবে, যে—যে বিজ্ঞান করতে এসেছে সে সেইরকম সাধকেরও মনোবৃত্তি আছে বলেই এইরকম বিরস বিষয় নিয়ে সে আলোচনা করতে রাজী হয়েছে। এগিয়ে চলতে চেয়েছে এই রকম বন্ধুর পথে। অন্তত তাকে এই স্বাধীনতাটুকু দাও যাতে এর ভেতর থেকে তার চিত্তাকর্ষক যা বলে মনে হয়, সেই জিনিস নিয়ে তারই রস সংগ্রহ করতে সে পারে। এই রকম ধরনের স্বাধীনতা না হলে সেখানেতে যাকে আমরা বলি talent, যেটা আজকাল বসু বিজ্ঞান মন্দিরেতে খোঁজাখুঁজি চলছে নাকি শুনেছি, সেটা হবে না। কেননা একটা বাঘ, ভাল্লুককে ধরে নিয়ে এসে যদি অনবরত বলা হয় "খিদে থাক আর না থাক্ তোকে গুঁতিয়ে খাওয়াবো" তাহলে তার ক্ষুধা চলে যায়। আমার বন্ধু শিবসুন্দরের দাদার একটা গল্পের কথা মনে হল, সেটা আর এখানে বলব না। সংক্ষেপে হল এই—তাঁর দাদা যাচ্ছিলেন নিমন্ত্রিত হয়ে, সেখানেতে নানান রকম খাওয়ার দ্বারা আপ্যায়িত হয়ে, শেষ পর্ব ছিল রসগোল্লার হাঁড়ি। তিনি যখন বললেন, একটার বেশি দুটো খেতে পারব না, তখন গৃহস্বামী, যিনি তাঁদের নিমন্ত্রন করেছিলেন, তিনি অভ্যাগতদের বললেন ( একটু গোলাপী নেশার আমেজ ছিল )—"কি রকম, আমি এত পয়সা খরচ করে রসগোল্লা নিয়ে এলাম, তুমি খাবে না ? তোমাকে মেরে খাওয়াবো।" তা সে আমাদের শিক্ষার ব্যাপারে অনেক সময়ে দেখা যায়। বিশেষ করে আজকের দিনেতে যা শোনা যাচ্ছে, যে শিক্ষার নতুন সংস্করণ যা বেরোচ্ছে তার ব্যবস্থা দেখে প্রাণে ভয় আসে। কোথায় এ সমস্ত জিনিস অন্য দেশেতে নিজের মাতৃভাষার মাধ্যমে যখন



শেখানো হয়, তখন সেটা সহজ ও সরল হলেও, তারা যখন চায় ছেলেদের কাছে বহু পরিমাণে বহু জিনিসের সঙ্গে পরিচয় তখন তারা স্বতঃই বুঝতে পারে যে এটা কিছু সম্ভব হবে না এত অল্পবয়স্ক ছেলেদের মধ্যে। কিন্তু আমাদের কর্তারা তাঁরা সে সব বিষয়ে ভাবেন না। তাঁরা ভাবেন একটু তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে হবে। এতদিন পর্যন্ত কিছুই করা হয়নি। আর যদি বা চীন আমাদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে তাহলে তো আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। অতএব পাঁচ বছরের ছেলেকে পর্যন্ত নিয়ে তাকে বিজ্ঞানের সমস্ত কঠিন বস্তুর সঙ্গে অন্তত পরিচয় করিয়ে দেওয়া দরকার। এই পরিচয়ের উপায় হল বই। এবং এ বিষয়ে সরকারকে সাহায্য করছেন গ্রন্থ লেখক এবং শিক্ষক। কেননা তাঁরা প্রত্যেক বৎসর বই বদলাচ্ছেন। একজনকে চেষ্টা করা হল সাত বৎসর বয়সেতে কিছু অঙ্ক শেখাবার। খানিকদূর পারলেন কি পারলেন না। তার পরের ক্লাসের লোককে আর একখানা বই দেওয়া হল যাতে সে আর একটু ভালো করে শেখাতে পারে। এইভাবে চলছে, অভিভাবকগুলি জেরবার। কারণ প্রত্যেক দিনে তিনটি করে ছেলেকে যদি লেখাপড়া শেখাতে হয় তাহলে তার চৌর্যবৃত্তি করা ছাড়া আর কোনো উপায় আছে বলে তো আমি মনে করি না।

এইভাবে আমাদের ভাবপ্রবণ দেশে যারা ওপর থেকেই স্বপ্ন দেখে এবং মাঝে যে কত খাদ এবং কত পাহাড় অতিক্রম করে তারপরে কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরে উঠতে হবে সে কথা ভুলে গিয়ে মনে করে যে আমরা এরোপ্লেনে চড়ে গিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার ওপর গিয়ে নেমে পড়ব। এইভাবে মনোভাব এবং সত্য কথা,—সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে তো কোনো তফাৎই নেই—কারণ যা সত্য, চিরন্তন সত্যের সঙ্গে যদি তার তুলনা করা যায় কোনোটাই সত্য বলা যাবে না, ব্যবহারবিদরা ঠিক করলেন, যে কোনো কথা বহুবার উচ্চারণ করা যাবে সেই কথাই সত্য হয়ে দাঁড়াবে। এটা আমার নিজের কথা নয়, এটা হিটলার বিশ্বাস করতেন এবং সুইডেনের লেখক বোইয়ার একটা বই লিখেছিলেন। তাতে বলেছিলেন "the power of a lie।" আমাদের দেশে এমন খুব সমীহ করে বলতে হয়, অসত্য কারুকে বলবার যো নেই—কারণ সেটা আপেক্ষিকতাবাদের মাধ্যমে একটা বিশেষ রকম দৃষ্টিভঙ্গিতে সত্য হয়ে দাঁড়াবে। কাজেই এই সমস্ত নানান রকম কথা আমাদের মনে রাখতে হবে।

কিন্তু এর ভেতর থেকে যেটা ফুটে উঠছে সেটা হচ্ছে এই যে আমাদের

দেশের সাধারণ নিয়মের মধ্যে দিয়ে যিনি যান নি, যিনি সাদা চোখে দেখেছিলেন সমস্ত জিনিসটাকে, যিনি বিশ্ববিষ্ঠালয়ের পুরুতদের হাতে পড়েন নি, যিনি চেষ্টা করেছিলেন জানালার খড়খড়ি তুলে আকাশের দৃশ্য দেখতে কিংবা জলে পাখি চড়ছে। সব জিনিস দেখে তার মনে যে বিস্ময় হয়েছিল সে পরিচয় সেই আনন্দটুকু আমরা পাই কিনা।

বিজ্ঞানীদের অনেক সময়ে পথের খোরাক হল এই যে, নানা রকম দুঃখ-কষ্ট হবে—বাড়িতে গেলে বৌয়ের মুখঝামটা খেতে হবে যে "তুমি কি এতক্ষণ করে এলে,—বাড়িতে যে চাল বাড়ন্ত এ তুমি খবর রাখছ না?" কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে যে সত্যিকারের আলোচনার ভেতর দিয়ে যে মনের আনন্দ পাওয়া যায়। এ আনন্দের বর্ণনা স্বার্থের ভিত্তিতে নয়। পৃথিবীর উপকার করব এ কথা ভাবলেও নয়। তার জবাব দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ যে এর এমন একটা আকর্ষণীশক্তি আছে যে মানুষের মন স্বভাবতই অভিভূত হয়ে পড়ে। এর মর্ম বুঝে যে শুধু আর একজনকে বোঝাবে তা নয়, তাতেই সে মোহিত হয়ে যায়। আমাদের সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-তারকা, এ সবের বিষয়ে আলোচনা করে আমরা অনেক রকম গোলমাল সৃষ্টি করেছি যে ভগবান যেন আমাদের জন্যই এতকাল চলে এসেছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিত্বের মধ্যেও সে সব কথা আছে—আমার জন্য তুমি আসছ এতকাল ধরে। কিন্তু জ্যোতির্বেত্তা একবার আকাশের দিকে তাকালে দেখবেন লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি জগৎ ব্রহ্মাণ্ড নীহারিকা নক্ষত্র। অবশ্য এতদূর যে তার মধ্যে কোনো ছোট পৃথিবী দেখা যায় কিনা। আজকাল সে যায় না, তবে কেউ কেউ বলতে আরম্ভ করেছেন "অন্তত আমাদের মতো একটা অবস্থা হবে তো।" কিন্তু সাংখ্যায়ন তত্ত্বের মূল হচ্ছে যে সাধারণ নিয়ম অনুসরণ করে যদি নানা রকমের প্রাথমিক অবস্থা থেকে চলা শুরু করা যায় তাহলে বহুদিন বাদে যে অবস্থায় আমরা এসে পৌছব তার মধ্যে একটা মোটামুটি সাদৃশ্য থাকবে। তোমরা জানো অবশ্য যারা এই Boltzmann-এর Entropy-র কথার বিষয়ে আলোচনা করেছ। অনেক সময়ে আমাদের এই সব কথাই ভাবতে হয় যে শুধু বস্তুজগতের বিষয়ে একথা খাটে কিংবা বস্তুজগতের মধ্যেই যে প্রাণের প্রকাশ এর বিশ্লেষণ করতেও কি সেই নিয়মই খাটাতে হবে? অর্থাৎ আমরা যেমন যুগ যুগ ধরে নানা রকম অভিব্যক্তির ভেতর দিয়ে প্রাণশক্তি মানুষে এসে পৌছেছি এই ধরনের কোনো রকমের প্রাণী দূর নক্ষত্রলোকে থাকতেও বা পারে।



যারা সোভিয়েতের নানা রকম বই পড়ো তারা দেখবে যে জুলভার্নের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এই রকম ধরনের গল্প-টল্প তারা লিখছে। 'Andromeda' বলে একটা গল্প লিখেছে তার মধ্যেও এই রকম ধরনের কথাবার্তা। কিন্তু এতো গেল গল্প। লোকে আশা করছে বেতারবার্তার মধ্যে যে নানা রকম আকস্মিক অদ্ভুত রকমের আওয়াজ শুনতে পাই তার ভেতরেতে ন্যূনতম কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় হয়তো আছে, আর এটা বিচার করলে জানা যাবে যে বহুদূরের কোনো নীহারিকামণ্ডলীর ভেতরে আমাদেরই মতো কোনো গ্রহে হয়তো এ-রকম চিৎশক্তির বিকাশ হয়েছে। এ সমস্ত কথা মানুষ ভাবতে শুরু করেছে। এবং এ ভাবনা শুধু কেবলমাত্র নিজের দুঃখ নিরসন নয়। একটা অদ্ভুত রকমের মনোভাব, এটা শুধু বিস্ময় নয়—যেন কতকটা স্রষ্টার মনোভাব--স্রষ্টার যে সৃষ্টি তার ভেতর দিয়ে তার সঙ্গে তাল রেখে ভাববার চেষ্টা করে তার মূলসূত্রটা ধরবার যে একটা চেষ্টা এটা শুধু কেবলমাত্র কবিত্বে পাওয়া যায় না—বিজ্ঞানীর মধ্যেও এ রকম মনোভাব আজকাল রয়েছে। কাজেই জ্যোতিবিজ্ঞানের মধ্যে তোমরা দেখতে পাবে অনেক সময়ে তারা ভাবছে কি ভাবে নীহারিকামণ্ডলীর সৃষ্টি হল, আর কি ভাবেই বা নক্ষত্রমণ্ডলী হল? ভগবান ঠিক একই সময়ে কি সৃষ্টি করে তারপর নাকে সর্ষে তেল দিয়ে ঘুমলেন আর বললেন, "যা হয় হোক"। না এখনও পর্যন্ত প্রতিমুহূর্তে জগৎ প্রসূত হচ্ছে আবার বিনষ্ট হচ্ছে? সব কথা ঠিক আমাদের দেশের পুরাণে পাওয়া যাবে না। অবশ্য হয়তো কেউ বলবেন যে গীতার অষ্টাদশ পর্বের মধ্যে দেখবেন ভগবানের মুখ থেকে কত লক্ষ লক্ষ জীব ঢুকছে আর বেরুচ্ছে। এ আলাদা কথা। অবশ্য আমার মনে হয় যে বর্তমানকে সহজভাবে স্বীকার করাই ভালো। আমাদের মনের মধ্যে একটা বিরুদ্ধভাব আছে যদি কেউ বলে যে আমাদের অতীতকালে কিছু ছিল না আমরা সহজেই চটে যাই।

আমার এক বন্ধু ছিলেন যিনি বেদের মধ্যে এক শ্লোক থেকে প্রমাণ করেছিলেন যে তখনকার লোকেদের নিশ্চয় এরোপ্লেনের সঙ্গে পরিচয় ছিল। অনেক শ্লোক বের করেছিলেন। রামায়ণের প্রথম শ্লোক থেকে অনেকে বলেছেন যে তারা কামানও জানতো ইত্যাদি অনেক ধরনের কথা।

বলতে ইচ্ছে করে এই, যে যেটা জানতো সেটা হচ্ছে এই যে হিংসা, দ্বেষ এখনকার মতনও তখন ছিল। আমার বন্ধু নির্মলকুমারের আনুকূল্যে তার ওখানে গিয়ে হরপ্পার কতকগুলো মাথা দেখলাম। তাঁরা খুঁজে বের করেছেন

যে কে বা কারা কতগুলো লোককে বেশ নির্মমভাবে হত্যা করেছিল বলেই মনে হয়। অবশ্য তারা কারা তা জানা নেই। এই হত্যাকাণ্ড চলছে আজকের দিনেও এবং কেউ যদি কথাটা বিশেষ করে বলতে পেরে থাকে যে এটার শেষ চাই ; কেননা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষসমাজ এক ;— একথা কেবল বিজ্ঞানীরাই বলেছেন। আমি সেইজন্য বর্তমান বিজ্ঞানীদের নমস্কার করছি। আর ভবিষ্যতে তোমরা যারা বিজ্ঞান-সাধক আছ, আমরা মনে করি যে, আমরা যা দেখে যাইনি তোমরা হয়তো দেখে যেতে পারবে, যাতে অনুভূতি নিবিড় হবে, যাতে তোমাদের প্রত্যেকের মনের মধ্যে একটা স্থির ধারণা থেকে যাবে যে মানুষ মাত্রেই এক এবং সকলে মিলে আমাদের এই মানবসভ্যতার সৌধ রচনা করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সেই মহামানবের আসার কথা তিনি বলে গেছেন, তিনি বলেছেন, তিনি পদশব্দ শুনেছেন। তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে আমরা তাঁর মনোভাব পাওয়ার চেষ্টা করি। দেখা যায় যে তিনি বোধ হয় সব সময়ে খুব গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন না। কিন্তু যেটা ছিল তাঁর, যে সমস্ত রকমের বাক্যজালের ভেতর দিয়েও যে চিরন্তন সত্য, যে সত্য হয়তো রূপায়িত হয়নি, যে সত্য নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চলেছে, সেই সত্যের পদধ্বনি তিনি শুনতে পেয়েছিলেন। তোমাদের ধন্যবাদ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে এক আলোচনা'-চক্রে বিজ্ঞানাচার্যের প্রতিভাষণ।
সম্পাদক, **পরিচয়**

গোপাল হালদার

# রূপনারানের কূলে

( পূর্বানুবৃত্তি )

অঙ্গন থেকে প্রাঙ্গনে

যে স্কুলে আমি প্রথম ভর্তি হই তা সত্যই বাসাবাড়ির প্রাঙ্গণ। 'বঙ্গ বিদ্যালয়' প্রায় ঘরের সঙ্গে। প্রাঙ্গণ থেকে বরাবর তার ছাত্র ও শিক্ষকদের দেখেছি, শিক্ষকদের অধ্যাপনা শুনেছি, মাঝে-মাঝে চড়-চাপড়-বেত্রাঘাতেরও সাক্ষী। কাজেই, এ স্কুলের কোনো নতুনত্ব ছিল না। গৌরবও বোধ করতে পারি নি। স্কুলটা বাঙলা। সেই জীর্ণ পাকা-বাড়ি ও পুরনো ঘরগুলি মর্যাদাসূচক নয়। পরিবারে যিনি আমার জুটি এবং জন্মাবধি আমি যার অনুগামী ( প্রফুল্ল হালদার, ডাক নাম 'সাধু' )—তিনি তখন ইংরেজি স্কুলে পড়েন, আর এই 'বাঙলা' স্কুলের প্রতি—তার ঘর-দুয়ারের প্রতিও—তাঁর অবজ্ঞা। আমারও তাই লজ্জাবোধ না করে উপায় কি ?

কথাটা পরিবারে কারও অজানা নেই—আমিও তা অন্যত্র ইঙ্গিত করেছি—আমার কাছে সে বয়সে আদর্শস্থানীয় ছিলেন এই দাদা ( তাঁকে আমি 'সাধু' বলেই ডাকি, আর দাদা বলে উল্লেখও করি না। বলব আমার জুটি—কিন্তু তিনি আমার থেকে প্রায় আড়াই বৎসরের বড়ো )। আদর্শ বদলে গিয়েছে, কিন্তু তাঁর প্রতি আমার আস্থা অম্লান। সে যা করত বাল্যে-কৈশোরে আমিও তাই করতাম—আজ যে করি না তার কারণ তা আমার সাধ্যাতীত। সে যা পড়ত, এক ক্লাশ পিছনে থেকে আমি তাই পড়তাম। প্রায় পঁচিশ বৎসর পর্যন্ত আমাদের চলা-ফেরা, খাওয়া-দাওয়া, ওঠা-বসা, সবই প্রায় এক সঙ্গে হয়েছে—যাঁরা জানতেন না তাঁরা এমনো মনে করতেন সাধু গোপাল বুঝি বাড়ির একই ছেলের নাম। কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেছি তখনো দু-জনার উপার্জন থাকত এক বাক্সে, এক সঙ্গে—তারপরে দু-জনার পথ পৃথক হয়েছে। যতটা রাজনৈতিক পথের ও জীবিকাপথের পার্থক্যে পৃথক্ হতে পারে। না হলে আমার রাজনৈতিক দুর্যোগেও সে আমার

সম্পর্ক ত্যাগ করে নি, কোনো সঙ্কটেই না। আমরা এককালে, আকাশ-পাতাল তফাৎ আমাদের মতামতে ও কর্মপথে। কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর বন্ধুরা আমার বন্ধু, আমার বন্ধুরাও তাঁর। এ কথাটা অবশ্য আরও যিনি বড়ো—আমার থেকে সাত বৎসরের বড়ো, তাঁর জ্যেষ্ঠ—রঙ্গীনদা'র সম্বন্ধেও সত্য। এঁদের দু-জনার বা বোনদের মধ্যে লক্ষ্মীর ( স্বর্গীয় ডাক্তার লক্ষ্মী হালদার ) কথা যথার্থ রূপে বলা আমার কেন, অনেকের পক্ষেই অসম্ভব। আমার পক্ষে অসম্ভব—কারণ, তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক অপরিমেয়ের কোঠায় পড়ে। অন্যের পক্ষে অসম্ভব, কারণ সত্যই এঁদের মতো বিশিষ্ট মানুষ বিশেষ দেখা যায় না।

কিসে এঁদের সেই বৈশিষ্ট্য ? হয়তো বৈশিষ্ট্য জিনিসটাই বিশ্লেষণাতীত না হলে সাধুকে শুধু বিচক্ষণ স্থিরচিত্ত ও দায়িত্বশীল সুহৃদ বললে কি বুঝানো যায় ? সেদিন বাদামতলায় মারবেল্ খেলায় তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না। অন্য পাড়ার সঙ্গে বারবার আমরা দ্বন্দ্বে নামতাম, সগৌরবে দেখেছি—অমন তাক্ কারো নেই। অব্যর্থ তার লক্ষ্য, অদ্ভুত সেই লক্ষ্যবেধ। অনেকের মারবেল তাঁর মারে ফেটে দু-ভাগ হয়ে গিয়েছে। লাট্টু খেলায়ও ঠিক তা ঘটেছে অন্যের লাট্টুর। অর্জুনকে দেখি নি, কিন্তু যে একাগ্রচিত্ততা মৎস্যের চক্ষু ছাড়া জলে অন্য কিছু প্রতিবিম্বিত দেখে না সে একাগ্রচিত্ততা আমি দেখেছি—দেখেছি তেমনি লক্ষ্যবেধ বাদামতলায় ও তারপরে। তার আর একটি জিনিসও ছিল সে সঙ্গে—সাধারণতঃ যা দৈহিক ক্লেশকর তাতে সাধুর ছিল অনিচ্ছা। ক্রিকেট খেলায় সে ব্যাটিং করত চমৎকার। কিন্তু তারপরে ফিল্ডিং-এর সময় পলায়ন করত অতি সুকৌশলে। হয়তো এই অনিচ্ছা বা অত্যন্ত সবল ব্যবহারিক বুদ্ধির জন্যই বা সামাজিক জীবনের নেতৃত্ব কামনা তিনি করেন নি—করতে পারতেন না। না হলে নেতৃত্বের বহু গুণ ছিল তাঁর জন্মগত। সেই কৌশলও ছিল চমৎকার আয়ত্ত—যেখানে তাঁর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবে না সেখান থেকে তিনি দূরে থাকতেন এমন একটি ভাব অবলম্বন করে যেন কাজটা তুচ্ছ, উপেক্ষণীয়। আত্ম-সচেতন মানুষ অনেক হয়, কিন্তু মাত্রা-সচেতন মানুষ কম। গুণ যাদের প্রচুর তারা গুণের সীমা সম্বন্ধে প্রায়ই অচেতন। পরিবেশ ও পরিপ্রেক্ষিতের টানেই যেমন গুণের বিকাশ তেমনি সেই পরিবেশ ও পরিপ্রেক্ষিতেরই টানা একটা সীমান্ত আছে—মাত্রা ছাড়াতে গেলে গুণ হয় দোষ। অথচ সে মাত্রা ছাড়াবার মতো



প্রেরণা প্ররোচনা ও প্রবর্তনাও তো চারিদিকেই শক্তির প্রেরণা, সাহসের প্রবর্তনা, উচ্চাশয়ের প্ররোচনা। গ্রীক ট্রাজিডির নায়কদের আত্মনাশ এই মাত্রালঙ্ঘনেই। এই গ্রীক্ মাত্রাবোধ আমাদের বুদ্ধদেবের 'মধ্যমপথের' সঙ্গে তুলনীয় হলেও এক নয়। গ্রীক মাত্রবোধ জীবনধর্মী, বৌদ্ধধর্ম বৈরাগ্যবাদী। ওসব বিচার-বিশ্লেষণ ছেড়ে বলতে পারি—'কমন্‌সেন্স' একটা 'অন্‌কমন্' গুণ আর আমার এই অগ্রজ অন্‌কমন্ মাত্রায় তার অধিকারী। অনেক গুণই তার ছিল—বিদ্যা-বুদ্ধি, বাক্-পটুতা, আড্ডায়-বৈঠকে, বিশেষ করে ড্রয়িং-রুমে বন্ধু-বান্ধবীর সমাবেশে পরিহাস-কুশলতা—রঙ্গ-স্থানীয় কারো সঙ্গে লাগতে তার ক্লান্তি নেই। ব্যঙ্গের ছোট ছোট বানে বিদ্ধ করারও অক্লান্ত ক্ষমতা। সে বান্ মর্মঘাতী নয়, কিন্তু চর্মঘাতী, তাতে মন ছট্‌ফট্ না করুক গা চিড়্‌বিড়্ করে। আবার, পরিমিত বিলাস-কলায় তিনি হতে জানেন ড্রয়িংরুম গোষ্ঠীতে আকর্ষণীয়, প্রীতিকর। এই সমাজের উপর নিজেরও আকর্ষণ প্রচুর, কিন্তু পরিমিত রকমে প্রচুর। সংসারে যাঁরা উঠতে পেরেছেন আপনা থেকে তাঁদের গোষ্ঠী গঠিত হয়ে যায়। যাঁরা পিছিয়ে পড়েছেন তাঁদের ফেলে যেতে হয় পিছনে—এই থিওরি অব ডাইনামিক্স কে না মানবে ? কিন্তু যাকে হৃদয়বত্তা বলে, qualities of heart, শুধু heart নয়, তা বিপদ ঘটায়। এই হৃদয়বত্তাও তাঁর আছে প্রচুর মাত্রায়। কিন্তু তাঁর 'কমনসেন্স' বা সুস্থ বুদ্ধি বিপদ ঘটাতেও দেয় নি। বিপদ ঘটায় নি বলেই তিনি যেমন, নিছক আপনার গুণে, কর্মদক্ষতায় আত্মপ্রতিষ্ঠ হয়েছেন তেমনি সেই আত্ম-প্রতিষ্ঠাকে আত্মীয়-বান্ধব স্বজন-পরিজন সহায়-সম্পদহীন অনাত্মীয় বহুজনের সম্ভবমতো প্রতিষ্ঠায়ও নিয়োজিত করতে পেরেছেন। ক্ষমতা দাম্ভিকতায় পরিণত হয় নি, এ জানে তাঁর আপিসের ছোট সহকর্মীরা। হৃদয়বত্তা ভাবালুতায় নিঃশেষ হয় নি, সম্ভবমতো পরার্থে রূপায়িত হয়ে সার্থক হয়েছে, এখানে তাঁর আত্মীয় অনাত্মীয় বহু উপকৃত। নিজের প্রতি ও পরের প্রতি কর্তব্য উদ্‌যাপনের সঙ্গত তৃপ্তির সঙ্গে আজ পরিণত জীবনে তিনি উত্তীর্ণ। আরেকটি কথাও বলা উচিত—তাঁর সুস্থবুদ্ধি ও সহৃদয়তা পুষ্ট, পালিত ও বর্ধিত হয়েছে আমার বউদির সাহায্যে—আমার সঙ্গে যাঁর সৌহার্দ্য তাঁর স্বামীর আমার প্রতি সৌহার্দ্যের অপেক্ষাও কম নয়।

বাড়ির সকলে পড়ে তখন ইংরেজি স্কুল জুবিলী স্কুলে। বাদামতলার বন্ধুরাও অন্য স্কুলে পড়েন—আমি একা সেই 'বঙ্গ বিদ্যালয়ে' পড়ি। তাতেও মনে বিদ্ধ হত।

বঙ্গ বিদ্যালয়ে আমি বোধহয় এক বা দুই বৎসর পড়েছি। এখানকার দুটি স্মৃতিই আমার আছে—প্রথম মাস্টারমশায়ের—আর কয়জন সহপাঠীর।

স্কুলে ইংরেজি পড়ানো হয় না। পরে ইংরেজি স্কুলে পড়তে গেলে অসুবিধা হবে। তাই স্কুলে ভর্তি হতেই বাড়িতে ইংরেজি পড়ানো ঠিক হল। ভার পড়ল ভুলুয়া কাছারীর একজন আমলার ওপর। ষোড়শী সেন মহাশয় আমার সেই মাস্টারমহাশয়, তিনি সেন-পাড়ার লোক—তাঁদের প্রায় সকলেরই বাড়ি বানাড়ি, বিদগাঁও বানাড়ি বলতে গেলে একই গ্রাম। এক সময়ে এই সেনদের প্রবল ছিল জাঁক। পদ্মা থেকে বিদ্গাঁয়ের খালের মোড়ে পৌছুলে বাজারের কাছে কর্তারা নৌকা বাঁধতেন, পাঁঠা কাটতেন, ভোজ্য পেয় এক দফা শেষ করে খাল দিয়ে চলতেন বন্দুক ছাড়তে ছাড়তে—জানুক সবাই 'মজুমদাররা প্রবাস থেকে বাড়ি আসছেন।' ভাগ্যটা আর এখন তত প্রসন্ন নেই। জ্ঞাতি-কুটুম্ব সুদ্ধ এখানেই প্রায় স্থায়ী বাসিন্দা—কালেভদ্রে দেশে যান। কিন্তু আছে তবু সেনপাড়ার দুর্দান্ত নাম। কিছু একটা কাজ কেউ করেন, কারও আছে সামান্য জমির আয়। কারও তাও নেই। কিন্তু তাই বলে গর্ব কম নয়, মাস্টারমশায় ছিলেন তার মধ্যে স্বতন্ত্র—গর্ব তাঁরও আছে, মনে করিয়ে দিলে বলতেন, 'হ্যাঁ, আমরাই বানাড়ির মজুমদার।' কিন্তু মনে করিয়ে না দিলে ভুলে থাকতেন। গর্বিত জ্ঞাতিগোষ্ঠীর মধ্যেও যেমন মিশে আছেন তেমনি মিশে আছেন অপর দশজনার সঙ্গে। সেন-পাড়ার লোকেরা তাঁকে নিয়ে গর্ব করবেন কি করে? কিন্তু শহরে বৈদ্যগোষ্ঠীর কেউ মারা গেলে ষোড়শীকে শ্মশানবন্ধু পাওয়া যাবেই। তাকে তাই কে অবজ্ঞা করবে? আমাদের বাড়িতে মেজ জেঠামশায়ের তিনি প্রায় সমবয়সী—সেন-পাড়ার অনেকেই জেঠামশায়ের আবাল্য বন্ধু। মাস্টারমশায়ও প্রায় সে পর্যায়ের। বেঁটে খাটো ছোট্ট মানুষটি, সামান্য স্থূলকায়, দীর্ঘ শ্মশ্রু। হেলে দুলে সাধারণ ভাবে চলেন ধীরে ধীরে। ভুলুয়ার কাছারির আমলা, আট নয় টাকা মাইনে, ধীরে সুস্থে কলম পিষেন, ঘণ্টায় বার দুই উঠে যান তামাক খেতে। বারকয় কাশেন, এক আধবার জল খান। সকালে-দুপুরে এমনি তার কাজ। ইংরেজি বাঙলা, অঙ্ক—যা তিনি জানতেন তা আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। আমার মতো ছ বছরের শিশুকে পড়াতে বা আমার সেই জুটি আট-নয় বছরের দাদাটিকে পড়াতে—বিদ্যা লাগে না লাগে ধৈর্য। কিন্তু যা যথেষ্টেরও বেশি ছিল



তা মাস্টারমশায়ের নিয়মানুবর্তিতা আর ধৈর্য। সকাল-সন্ধ্যা দু-বেলা—শনি-রবি বাদ নেই—ঠিক সময় তাঁর ডাক শুনতে পাব—গোপাল, সাধু। 'পড়তে আয়।' পড়া দেওয়া, পড়া নেওয়া, মামুলী ব্যাপার, তার বেশি কিছু নয়। ম্যারের 'স্পেলিং বুক' থেকে আমরা বানান শিখতাম। অর্থ মুখস্ত করতাম। বাঙলা বই ও তার অর্থবই থেকেও মুখস্ত করতাম। যোগ-বিয়োগ পুরণ ভাগ ক্রমে ক্রমে শিখে উঠেছি। ওসব শেখার ব্যাপারে তাঁর কৃতিত্ব এই—তিনি শিখাতেন না, শিখতে শিখাতেন। তিনি বসে থাকতেন—মন অন্য দিকে গেলে তা ফিরিয়ে আনতেন। সন্ধ্যায় ঘুম পেলে সে ঘুম ভাঙিয়ে দিতে জানতেন—"কী করে তোর বড়দা মাছটা ধরল রে?" মুদিত চোখ খুলে আমি বলি, "সকাল থেকে বসে রয়েছেন—চুপ করে কড়ুই গাছটার তলায়। মাছটা ঘুরছে, কিছুতেই ভাসে না।..." সাগ্রহে বর্ণনা করি। হায় সরস্বতী তোমার যে কত ছলনা তা কি তখন জানতাম। বর্ণনা শেষ হতে মাস্টার মশায় বলেন "ওর মেছোরাশি। কিন্তু এখন পড়।" আবার মুখস্ত করতে বস্তাম। অবশ্য তাতে তখন বেগ পেতে হত না। কিন্তু সে পড়া না বলতে পারলে ছুটি নেই, তিনি উঠতেন না। বিষ্টি-বাদল ঝড়-তুফান—কিছুতেই কিছু হবে না। ঠিক সময়ে সেই নাম ধরে ডাক শোনা যাবে—। মাস্টারমশায় ঠিক এসেছেন—পড়তে বসতে হবে, আর পড়া দিতেও হবে। অঙ্কে একটা একটা সুবিধা ছিল—মাস্টারমশায় ফল মিলেছে দেখলেই সন্তুষ্ট। তা না মিললে একটু দেখে শুনে আমরা ঘোষণা করতাম—"ছাপার ভুল।" মাস্টারমশায় বলতেন 'দেখি।' কিন্তু ভুল প্রায়ই তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যেত। এমন না হলে এমন অঙ্কে অবিশ্বাস জন্মাত কি করে? কিন্তু ইংরেজি বাঙলায় তো অর্থ ভুল না, বানান ভুল করবার পথ নেই। মারবেল খেলা, লাট্টু খেলা, জামরুল গাছের পাকা ফল, বাদামতলার নানা আয়োজন—কিছুতে বাধা নেই। শুধু এ পড়া দিয়ে নিতে হবে।

বৎসর চার-পাঁচ মাস্টারমশায় প্রথম আমাকে, পরে আমাদের দু ভাইকে পড়ালেন। আমরা উঁচু শ্রেণীর লেখাপড়ার অন্য রাজ্যে প্রবেশ করি অন্য শিক্ষকরা আমাদের ভার নেন। আশ্চর্য হয়ে দেখতাম—তারা অর্থবই না দেখে বাঙলা-ইংরেজি পড়া নেন; পাটীগণিতের ফলের পৃষ্ঠার একটা ফলও ভুল ছাপা বের হয় না। কিন্তু অত সহজ স্বচ্ছন্দ ভাবে তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে পারি না। কেমন ভয় করে। মাস্টারমশায়ের কাছে কোনো

ভয় ছিল না। আমাদের দুরন্তপনা তাঁর কাছে অনাবৃত আত্মপ্রকাশ করত—বাড়ির পিতামাতার মতো তিনি আমাদের শাসন করতেন—তিনি কীল দিলে চাপড় দিলে গায়ে লাগত কিনা জানি না! আমরা হেসে গড়িয়ে পড়তাম। তিনি বলতেন, "বাঁদরগুলোর গায়েও লাগে না।"

আমাদের পরে আমার কনিষ্ঠরা লেখাপড়ায় পা দিতেই এই মাস্টারমশায় আবার তাঁদের মাস্টারমশায় হন। তারপরে ভাগ্নেদের এক আধজনার। তারপর পাড়া-প্রতিবেশীদেরও ছেলেদের। শেষে সমস্ত শহরে তাঁর এই পরিচয়টাই প্রধান হয়ে যায়—'মাস্টারমশায়।' কিন্তু আমাকে নিয়েই তার প্রথম এই পরিচয়।

নিঃসন্তান মাস্টারমশায়ের পরিচয়টা তবু অসম্পূর্ণ থাকে যদি না বলি তার স্ত্রীর কথা। তাঁর সাধারণ পরিচয় 'জেঠাইমা'—দুর্ধর্ষ সেন-পাড়ার অল্পাধিক গর্বিত নারীকুলের মধ্যে তিনি অগ্রগণ্যা—গর্বে বিন্দুমাত্র নয়, সকলকে সমজ্ঞানে, সকলের প্রতি মমতায়, সকলের স্নেহে, সেবায়, অকাতরে পরিচর্যায়। সেদিনের মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের ঘরের সাধারণ মেয়ে; গ্রামের সাধারণ শিক্ষাদীক্ষাই বোধহয় তিনি পেয়েছিলেন, তার বেশি নয়—শ্যামাঙ্গী, বড় টানা টানা চোখ, সুন্দর মুখশ্রী। শান্ত স্নেহশীল দৃষ্টি তাঁর মুখে চোখে, করুণ ও করুণাভরা ব্যক্তিত্বে সে চোখমুখ কোমল। যে শ্রী স্বাভাবিক শ্রী এই নিঃসন্তানা মহিলার মাতৃশ্রী অন্তরে-বাহিরে তাই ছিল স্বচ্ছন্দ সহজ অকুণ্ঠিত। আশ্চর্য নয় যে, একাধিক কিশোর ও যুবকের তিনি 'মা' হয়ে গিয়েছিলেন। বাকী অনেকেরই হয়েছিলেন 'জেঠাইমা'—যার কাছে তারা সহজ ভাবে গিয়ে বসবে, গল্প করবে, গল্প শুনবে—আর সামান্য কিছু চিঁড়া, নাড়ু পেলে পরম আনন্দে তা খেয়ে নেবে। আমার তো কথাই নেই—তিনি তো আমার কাছে 'জেঠাইমা' সেই ছয়-সাত বৎসর বয়স থেকে। আর নোয়াখালির জীবনের শেষদিকে যখন সেন-পাড়া ভেঙে যাচ্ছে তখন নতুন ভুলুয়া-পাড়ায় আমরা ছিলাম প্রতিবেশী—কলকাতা থেকে কবে আমি ফিরব মায়ের মতো তিনিও তার দিন গণতেন।

১৯৩৩ সালে আমি যখন বকসা বন্দিশালায় তখন একদিন বাড়ির চিঠিতে জানলাম—'মাস্টারমশাই' নেই। সেন্সরের অনেক বেড়া ডিঙিয়ে একখানা চিঠি দিতে পেরেছিলাম জ্যেঠাইমাকে, উত্তরও পেয়েছিলাম। তাঁর সেই পুত্রদের একজনার সংসারে তিনি ক্রমে মিশে গিয়েছিলেন। এমন মানুষই



যে অন্তরে অন্তরে আমার এ ধারণা কি একটা মিথ্যা কল্পনা, ভাববিলাস? সেই অসামান্য মানুষ—যাদের নিয়ে তৈরি হয় শরৎচন্দ্রের 'জেঠাইমা', রবীন্দ্রনাথের 'আনন্দময়ী'।

প্রথম মাস্টারমশায়ের কথা যতটা বলতে পারি প্রথম স্কুল বা সে স্কুলের মাস্টারমশায়দের কথা তত বলতে পারি না। কারও কারও কথা মনে আছে—বাড়ির সঙ্গেই স্কুল, কাজেই স্কুল ছাড়ার পরেও তাঁদের থেকে দূরে চলে যাই নি। কিন্তু দু-জন প্রথম সহপাঠী আমার চিরদিনই ঘনিষ্ঠ বন্ধু থেকে গিয়েছেন—অমৃতকণ্ঠ চট্টোপাধ্যায় ও হরিগোপাল গঙ্গোপাধ্যায়। অমৃত ঢাকা থেকে বি.এ. পাশ করে ধানবাদে বীমা-ব্যবসায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত; হরিগোপাল যাদবপুর থেকে পাশ করে অধ্যাপনায় সেখানেই সুপরিচিত। দু-জনেই সমাজ-সংসারে সম্মানিত, কর্তব্যপরায়ণ ও স্থিরস্বভাব। যুগের আঁচ-এ তাঁরাও হাত এক-আধটুকু পুড়িয়েছেন। কিন্তু সুস্থ স্বাদেশিকতা ও সংসারধর্মে তাঁরা একটা মিলনও ঘটাতে পেরেছেন। হরিগোপালের সঙ্গে অবশ্য সেই প্রথম দুবৎসরই এক স্কুলে পড়েছি। অমৃতের সঙ্গে পড়েছি পরেও ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করা পর্যন্ত। সে আবার নিকট কুটুম্ব, সেই স্কুলে পড়তেই। আমার সহোদরা অগ্রজার বিয়ে যখন হচ্ছে, আমার তখন সাত বৎসর বয়স—বিবাহ-সভায় দেখি অনেক বড়ো-ছোট বরযাত্রের মধ্যে আমার সহপাঠী অমৃত। জিজ্ঞাসা করতে বললে, "আমার দাদার বিয়ে।" আর আমি বললাম, "আমার দিদির বিয়ে।" সেই যে নতুন সম্পর্ক তা অচ্ছেদ্য, কিন্তু তার থেকেও বেশি হয়ে উঠল আমাদের দু-জনার সহপাঠীরূপে একসঙ্গে পড়া, একসঙ্গে খেলা, প্রতিদিনের ছোট-বড়ো হাজার কাজে সাহচর্য। এতটাই তা অকুণ্ঠিত যে তাকে কিছুমাত্র না জানিয়ে তার বেনামীতে নন কো-অপারেশনের সমর্থনে একটা প্রবন্ধ লিখে তাকে একবার বিড়ম্বিত করতেও দ্বিধাবোধ করি নি। মাঝে-মাঝে সুদীর্ঘ অদর্শন ঘটে, সম্ভবত আমাদের রাজনৈতিক-সামাজিক মতামতেও সাদৃশ্য নেই। নিশ্চয়ই আমার অ-সামাজিক চালচলনে তার সুস্থির কর্তব্যপরায়ণতায় দীর্ঘতর ব্যবধান। কিন্তু একটা কথা জানি—তার সঙ্গে আমার সাযুজ্য অপ্রতিহত। হরিগোপালের সঙ্গে স্কুলের ব্যবধানে যে নৈকট্য জমতে পারে নি, তারপরে তা তেমনি ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে—আর আজও শেষ হয় নি। সে ঘনিষ্ঠতার পরিমাণ এই কথাতেই বলা যাবে—একবার এক পলায়িত

রাজনীতিক সহকর্মীর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা ও কথাবার্তার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। স্থান ঠিক করতে গিয়ে হরিগোপাল ছাড়া আর কারো কথাই মাথায়ও এল না। সমস্ত রাত্রি তর্ক ও কথাবার্তা বলে শেষ রাত্রিতে আমার সহকর্মী হরিগোপালের আশ্রয় থেকে বিদায় নিলেন, আর সকালবেলা আমি। দলভুক্ত না হলেও যে বন্ধুকে বিপন্ন করতে দ্বিধা করি না—হরিগোপাল তেমনি বন্ধু, মানুষ হিসাবেও তেমনি মানুষ। একটা অপাতস্থিরতায় চাপা শান্ত রসিকতা তার সঙ্গকে করে তুলেছে আরও আকর্ষণীয়। উচ্ছ্রিত হাস্যকৌতুক নয়, স্মিতহাসির সঙ্গে এক-আধটি মন্তব্য বা প্রশ্ন—তাঁর 'ড্রাই হিউমার'-এর বৈশিষ্ট্য।

**জুবিলী স্কুল**

বৎসর দেড়েক পরে ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হলাম। একটা খেদ মিটল। জিলা স্কুল নিশ্চয়ই অনেক ভালো স্কুল, কিন্তু তা অনেক দূরে, জুবিলী স্কুল সে তুলনায় নিকটে। বিশেষত এ-স্কুলেই আমাদের বাড়ির সবাই পড়েছেন, বাবাও করেছেন পূর্বে শিক্ষকতা; পরে বরাবর ছিলেন তার কমিটির সদস্য। কাজেই অন্য স্কুলে আমার পড়ার প্রশ্ন ওঠে না। একটা প্রশ্নই উঠেছিল—ঘরে ইংরেজি পড়ায় আমি এক ক্লাশ উপরে ভর্তি হলাম। তা তেমন কিছু নয়। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছিল—বয়স লেখানো হবে কত? কারণ, ম্যাট্রিকুলেশনের সময় ষোল বৎসর সম্পূর্ণ না হলে তখন ঠেকে থাকতে হত। যিনি ভর্তি করতে নিয়ে যাবেন বাবা তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে বললেন: "এক বৎসর কমিয়ে লেখ—কতবার ফেল করবে কত ক্লাশে তার ঠিকানা কি?" বাড়িতে আমাদের সকলের সম্বন্ধেই এরূপ ছিল প্রত্যাশা। বাবার ধারণাটা নির্ভুল হয় নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও ম্যাট্রিকে যে আমাকে ঠেকে থাকতে হয় নি—সে আমার স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের কৃপা। তাঁরা খাতার অঙ্ক থেকেও ছাত্রের মনটাকে বড় বলে জানতেন। আর সত্যের মর্যাদাও তাতে রক্ষা পায়। কারণ ১৯১৮ ফেব্রুয়ারিতেই আমার ষোল বৎসরই পূর্ণ হয়।

ইংরেজি স্কুল—কাজেই মর্যাদা বোধ করলাম। অবশ্য লেখাপড়ায় উৎসাহ বাড়ল, এমন নয়। ও বস্তুর জন্য সে স্কুলে তাড়না ছিল না। তারপর আমরা হাইস্কুলের চক্ষে লালনীয় শিশু, তাড়নী বালকও নই। পড়া



অপেক্ষা আমাদের পাহারা দেবার জন্য কোনো শিক্ষক ক্লাশে থাকলে হয়। সব সময়ে তাও থাকত না, আমরা স্বাধীনতা ভোগ করতাম। স্কুল আমার কাছে তাই বিভীষিকা হয় নি—বরং নতুন নতুন সহপাঠীর সঙ্গে মিশবার, বাইরের সঙ্গে জানাশোনার পথ তৈরি করে দিয়েছে। শিক্ষার বিধি-বিধানও ছিল শিক্ষকদের নিজেদের মতানুযায়ী। লেখাপড়া শিখতে গিয়ে কানমলা, চপেটাঘাত পেলে ছাত্ররা তখনো অপমান বোধ করত না। বেত বা বাঁশের কঞ্চির প্রয়োগটা গুরুতর কারণে হত, আর তাতে ছাত্রদেরও মনে একটু ব্যথা জাগত। ইংরেজি পড়া আরম্ভ হয় সেই স্পেলিং বই থেকে, তা আমার পূর্বেই আয়ত্ত। তবে মাস্টারমহাশয় ছিলেন নিজের বানান-পাণ্ডিত্যে গর্বিত, উচ্চবংশের ব্রাহ্মণ বলে প্রতাপশালী লোক, আর ছাত্রদেরও যথেষ্ট ভীতি-সম্ভ্রমের পাত্র। আমারও তা ছিল। কিন্তু ভীতির কারণ তিনি হন নি—কারণ তাঁর শাস্ত্রটা আমার পূর্বেই গৃহে আয়ত্ত। উপরের ক্লাশের বড়ো ছাত্রদের বানানে ভুল হলে আমাকে দিয়ে তা শুধরে দিয়ে তাদের অপমান করিয়ে তিনি তাদের শিক্ষা দিতেন। তাঁর নির্দেশ মতো বড়োদের এভাবে অপমান করে একটা লজ্জা আমরা বোধ করতাম। কিন্তু সাহস কি আপত্তি করি? সেই স্পেলিং-বিশেষজ্ঞ মাস্টার-মহাশয়ের 'এ্যাক্সেন্ট' মাহাত্ম্য বুঝে উঠতে পারি নি। অথবা, যা অভ্যাস করেছিলাম পরবর্তী কালে তা অন্য মাস্টারমশায়দের কৃপায় বেশ মসৃণ হয়ে সম্পূর্ণ 'বাবু ইংরেজি' উচ্চারণে এসে সুস্থির হয়েছে।

এই শিক্ষাবিধির দৌরাত্ম্য অবশ্য তখনি শেষ হচ্ছিল, শেষ হয়েও যায়। কিন্তু অঙ্কের শিক্ষকমহাশয়ের শিক্ষাপদ্ধতি আমাদের অনেককে পঙ্গু করে দিয়েছিল। বাড়ি থেকে মিশ্রপূরণ এক-একদিনে ২৫।৩০টা কষে আনতে তিনি নির্দেশ দিতেন। ও-বয়সে অতগুলো অঙ্ক চাপানো একটা অত্যাচার। অন্য বিষয়ও তো পড়তে হয়, লিখতে হয়। অনেক ছেলেকেই অক্ষমতার জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে হত। শেষ পর্যন্ত আমরা অনেকেই ঠিক করলাম পাঁচটা বা সাতটার বেশি করব না। সেদিনের 'একটা ছাত্র-ধর্মঘট।' সারা ক্লাশ দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর তিনি অঙ্কের বোঝা কমালেন, কিন্তু অঙ্কের প্রতি যে অপ্রীতি তিনি জাগালেন তা লুপ্ত হল না। তাতে উৎসাহ জোগালেন—না জেনেই আমার গুরুজনরা—"আমাদের পরিবারের অঙ্কে মাথা নেই।" ঠিক এ সময়েই আমার দাদা

সেকেণ্ড ক্লাশ থেকে ফার্স্ট ক্লাশে উঠলেন—অঙ্কে শূন্য পেয়ে। ও স্কুলে তাতেও বাধে নি। কারণ, দাদা ইংরেজি, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে মার্ক ভালো করেন, বাঙলায় ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী ; আঁকায়-লেখায়, বলায়, আবৃত্তিতে অগ্রগণ্য। তাঁর অঙ্কে অকৃতিত্ব প্রতিবেশীদেরও মন্তব্যের বিষয় ছিল। অবশ্য তাঁরা সকলে জানতেন—"আমাদের বাড়ির ছেলেদের কিছু হবে না।" আমিও যখন একটা ক্লাশে অঙ্কের পরীক্ষায় মাত্র আধাআধি মার্ক পেলাম—অন্য বিষয়ে আশী থেকে একশোও ছিল—লজ্জিত অপদস্থ ভাবেই বাড়ি ফিরলাম। দাদার সঙ্গেই প্রথম দেখা। তিনি আমার লজ্জার কথা শুনে বললেন, "যা। আমি পাই শূন্য, তুই তো তবু পঞ্চাশের ওপরে পেয়েছিস।" এমন অকৃত্রিম উৎসাহ তাঁর থেকে বরাবরই এরূপ অপমান-অগৌরব-মুহূর্তে পেয়েছি। কিন্তু সেদিনকার কথা এখনো মনে আছে। তাই ওপরের ক্লাসে উঠে আমি যখন অঙ্কে আর একটি মার্কও খোয়াতাম না—সকল বিশ্ববিত্তালয়ের পরীক্ষার পাটীগণিত, বীজগণিত ও জ্যামিতির আঁক আমার পরে আয়ত্ত হয়ে গিয়েছিল—তখন সেই অঙ্কের মাস্টার মণীন্দ্রবাবুর সস্নেহ প্ররোচনায়ও অঙ্ককে 'বিশেষ অধীতব্য' বিষয়রূপে গ্রহণ করি নি। সেদিনকার অস্বীকৃতির মধ্যে স্পর্ধাও ছিল। তার পরিতাপ আমাকে পরবর্তী সময়ে প্রতিদিনই করতে হয়েছে ; কারণ, বুঝেছি অঙ্কের প্রতি অবজ্ঞায় আমার পক্ষে বিজ্ঞানের দ্বার রুদ্ধ ; আর বিজ্ঞান একালে যার অনধিগম্য তার কাছে একালও অনেকাংশে বুদ্ধিতে অনায়ত্ত। কিন্তু এই দুঃখটার মূল খুঁজতে গিয়ে এখনো পাই সেই আট-নয় বৎসর বয়সে অঙ্কর মাস্টারমশায়ের দুর্বোধ্য তাড়না। সে মাস্টারমশায়ের কিন্তু অন্য গুণও ছিল। যখন ইতিহাসের কিছুই জানতাম না, আমাদের ক্লাশে গল্প বলতে বসে তিনি একদিন এক আশ্চর্য গল্প বললেন—আর্য-অনার্যের গল্প আর সবিস্ময়ে শুনলাম আমরা নাকি সেই আর্যদের বংশধর। তাঁরই মুখে কোনো কাজে আমাদের অমনোযোগ বা অযত্ন দেখলে শুনতাম—"হারে, তোদের দিয়ে কি ভারত-উদ্ধার হবে ?"

সে বোধহয় ১৯০৯-১০-এর কালের কথা। তাই কথাটা আমাদের কানে একবারে অশ্রুতপূর্ব নয়। কখন কিভাবে তা জীবনে বড়ো কথা হয়ে উঠল সেই বিশেষ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। কিন্তু কথাটা দেশে তখন প্রধান হয়ে না উঠলে তিনি আমাদের এ কথা মনে করিয়ে দিতে চাইবেন কেন ? আর মনের উদ্বোধন যাঁর শিক্ষাপদ্ধতিতে অনুমোদিত, তাঁর অঙ্কের সেই অশুভ তাড়না নিয়ে তাঁর প্রতি বিরূপ হতে পারি না।

( ক্রমশ



অন্নদাশঙ্কর রায়

# পাণ্ডববর্জিত দেশ

শান্তিনিকেতন, ৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৬৪

শ্রীসিদ্ধেশ্বর সেন

প্রীতিভাজনেষু,

ভাবছি বইকি। না ভেবে উপায় আছে ? হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাত। বাংলাদেশের দুই প্রান্তে সাম্প্রদায়িক প্রাণহানি। লুটতরাজ। গৃহদাহ। লক্ষ লক্ষ টাকার বই ও লক্ষ লক্ষ মণ ধান অগ্নিসাৎ। সেই সঙ্গে সংস্কৃতি ও সভ্যতা ধুলিসাৎ। যথারীতি লোকবিনিময়ের উদ্যোগ। পূর্ববঙ্গ ত্যাগের জন্যে আকুলিবিকুলি। জনস্রোত।

কাশ্মীর নিয়ে যুদ্ধ, কিন্তু কাশ্মীরের মাটিতে হচ্ছে না। হচ্ছে বাংলাদেশের শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে, বন্দরে বন্দরে। অন্তরে অন্তরে। এর ফলে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান কতটুকু নিকটতর হল জানিনে, কিন্তু বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের জীবন আরো দুর্বহ হল। জাতিহিসাবে আমরা আরো দুর্বল, আরো দীনহীন, আরো পরনির্ভর হলুম। যা নিয়ে আমাদের গর্ব—সাহিত্য ও শিল্প—তার আধারটাই আমরা নিজেরাই ধ্বংস করে দিলুম।

সরকার যথাসাধ্য ক্ষতিপূরণ করবেন। কিন্তু কিসের ক্ষতিপূরণ ? এমন ক্ষতি আছে যার পূরণ নেই। হিন্দু-মুসলমান পরস্পরকে বিশ্বাস করে একরাষ্ট্রে থাকতে পারবে কি ? তার জন্যে লাগবে শুধু পুলিশের লাঠি নয়, মিলিটারির সঙীন। এক পাড়ায় বাস করার সাহস ক'জনের হবে ! এ যেন নদীর তীরে বাস ভাবনা বারো মাস। বিশ্বাস বা আস্থা হচ্ছে অত্যন্ত ভঙ্গুর একটি পাত্র। ফুটো হলে বা ফেটে গেলে সহজে জোড়া লাগে না।

মানুষের হৃদয়ও তেমনি ভঙ্গুর। কেমন করে মানুষ ভালোবাসবে মানুষকে, যদি সে পরকে আপন ভেবে আপনার লোককে পর করে দেয় ? সাত শ' বছর যে তোমার সুখ-দুঃখের সাথী, হয়তো আরো সাত শ' বছর সাথী হতে পারত, তাকেই তুমি পর করে দিলে রাওলপিণ্ডির বা করাচীর ইঙ্গিতে।

তোমার দুর্দিন কি কোনোদিন আসবে না? সেদিন কে তোমার প্রকৃত বন্ধু হবে? বাঙালী হিন্দু না পশ্চিমা মুসলমান?

তেমনি বাঙালী হিন্দুরও প্রকৃত বন্ধু বাঙালী মুসলমান। কী করে আমি এদের বোঝাব যে ইতিহাস ষোল-সতেরো বছরে শেষ হয়ে যায় না। শতাব্দীর পর শতাব্দী রয়েছে সামনে। হিন্দুও থাকবে, মুসলমানও থাকবে। একটাই জাতি, একই নিয়তি। সাময়িকভাবে বিচ্ছেদ ঘটতে পারে, তার পরিণাম হাড়ে হাড়ে অনুভব করে বিচ্ছেদেও একদিন অনিচ্ছা আসবে। বই পড়ে শেখে ক'জন! অধিকাংশ লোক শেখে হাতে-কলমে। আগুনে হাত দিয়েই শেখে যে আগুনে হাত দিতে নেই।

অন্তত কয়েকজন থাকবেন যাঁরা পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের হিন্দু ও মুসলমানের প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষী। তাঁরা হাজার আঘাত পেলেও ভবিষ্যতের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন না। বর্তমান থেকেই ভবিষ্যতের উদ্ভব। সুতরাং বর্তমানের উপরেও এক চোখ রাখতে হবে বইকি। তা বলে তাঁরা একচোখো হবেন না। রাজনীতিকদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ যিনি বর্তমানের প্রতি মনোযোগী হয়েও ভবিষ্যতের ধ্যানে নিমগ্ন। তেমনি সাংবাদিকদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ যিনি বর্তমানের প্রতি সতর্ক, অথচ ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর। সাহিত্যিকদেরও তেমনি বর্তমান আর ভবিষ্যৎ দুই দিকে নজর রাখতে হবে।

এ কখনো সত্য হতে পারে না যে পূর্ববঙ্গের সকলেই উন্মত্ত বা সকলেই হিন্দুদ্বেষী। এই তো কয়েকজন প্রাণ বিসর্জন দিয়ে প্রমাণ করে গেলেন যে তাঁরাই পূর্ববঙ্গের হৃদয়। সে হৃদয় হিন্দুকেও ভালোবাসে, হিন্দুকেও বাঁচাতে চায়। বিজ্ঞাপনটা কিন্তু পাষণ্ডরাই একচেটে করল। পশ্চিমবঙ্গেও তাই। আমি বন্দনা করি পূর্ব ও পশ্চিমের দরাজ হৃদয়কে। বন্দনা করি আমীর হোসেন চৌধুরীকে, মিশ্রীলালকে, আরো কয়েকজন অনামা শহীদকে। আমি বন্দনা করি সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়কে। উৎপল দত্তকে। তাদেরি মতো মানবপ্রেমিকদের।

এ যদি সত্য হয়ে থাকে যে বাংলাদেশ এক ও অবিভাজ্য তাহলে একদিন না একদিন সেই সত্যের জয় হবে। আমরা হয়তো দেখে যেতে পারব না সে দৃশ্য। তবু তার ধ্যান করব। সেই যে আমাদের চিরকালের বাংলাদেশ তাতে হিন্দুও থাকবে, মুসলমানও থাকবে, খ্রীষ্টান বৌদ্ধরাও বাদ যাবে না। তাই



যদি হয় তবে আজকের এই ছিন্নমস্তা দেবীকে আপনার রক্ত আপনি পান করতে দেখে উদ্‌ভ্রান্ত হব না। এটা সত্যরূপ নয়।

তবে এটাও ঠিক যে দেশটা ক্রমে পাণ্ডববর্জিত হয়ে উঠছে। যেমন পূর্ববঙ্গ তেমনি পশ্চিমবঙ্গ। বাঙালীকেই বাঙালীর হাত ধরে তুলতে হবে। মুসলমানকে হিন্দুর হাত। হিন্দুকে মুসলমানের হাত। এপারের সাহিত্যিকরা যে যুক্ত বিবৃতি দিয়েছেন সেটি এই ধরনের কাজ। তেমনি ওপারের সম্পাদকরা যে যুক্ত বিবৃতি দিয়েছেন সেটিও। দুই প্রান্তের লেখকদের দিয়ে কি মিলিতভাবে কিছু করা যায় না? নিশ্চয়ই করা যায়, কিন্তু করতে গেলে পূর্বপাকিস্তান সরকার বাধা দেবেন। একসঙ্গে মিলেমিশে কিছু করা তাঁদের মূলনীতিবিরুদ্ধ। অমন করলে দুই 'জাতি' এক হয়ে যাবে। এদিকেও বাধা পাওয়া যাবে? সরকারের কাছ থেকে নয়। বিক্ষুব্ধ জনমতের কাছ থেকে। পূর্বপাকিস্তান যে অন্যায় করেছে তার বেলা কী হবে?

এই পরিস্থিতি যদি বেশিদিন গড়ায় তাহলে এদিকে অন্যায়বোধ তীব্রতর হবে। আর ওদিকে যারা অসহায় বোধ করছে তাদের অসহায়তাবোধ হবে গভীরতর। আমরা লেখকরা এর কী করতে পারি? আমরা এমন কোনো মন্ত্র জানিনে যা দিয়ে অন্যায়ের হাতে হাতে প্রতিকার হয়। আর অসহায় অসহায়াদের উদ্ধার হয়। আমাদের হাতে যা আছে তার নাম তলোয়ার নয়, তার নাম কলম। শোনা যায় কলম নাকি তলোয়ারের চেয়ে প্রবল। হতে পারে, কিন্তু এই অবস্থায় নয়। আর তলোয়ারও কি এ ক্ষেত্রে কাজে লাগবে? যুদ্ধঘোষণা করলে সৈনিকরা চলে যাবে সীমান্ত রক্ষা করতে। শহর রক্ষা করার ভার পড়বে পুলিশের উপর। গ্রাম রক্ষার ভার চৌকিদারের উপর। এরা কি সংখ্যালঘুদের ধনে প্রাণে বাঁচাতে পারবে? পূর্ব বা পশ্চিমবঙ্গের কোনোখানেই যথেষ্ট পুলিশ বা চৌকিদার নেই।

সংখ্যালঘুদের একমাত্র ভরসা সংখ্যাগুরুদের শুভবুদ্ধি। যেমন এখানে তেমনি ওখানে। বাঙালী হিন্দু-মুসলমান যদি পরস্পরকে মেরে সাবাড় করতে চায় তবে কে বাঁচাবে? যদি সীমানা পার করে দিতে চায় তবে কে ঠেকাবে? শান্তির সময়েও দেখা গেল পুলিশ পেরে উঠছে না, মিলিটারি এসে না থামালে এপারে বা ওপারে কোনো পারেই থামত না। যুদ্ধকালে কে থামাবে? আমরা গান্ধীজীর কাছ থেকে শিখিনি। কেমন করে মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলবানের হাত থেকে দুর্বলকে রক্ষা করতে হয় তা

জানিনে। শান্তিসেনা যদি বা গঠন করা গেল তাকে ঠিক সময়টিকে ঠিক জায়গাটিতে পাওয়া গেল না। এত বড় একটা দায় দু-চারজন আদর্শবাদীর স্বতঃস্ফূর্ত ভাবাবেগের উপর ছেড়ে দেওয়া যায় না। রাজনীতিকদের এ দায় নিতে এগিয়ে আসা উচিত, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁরা আসেন না।

সুতরাং যা হবার তা হবেই। মানুষ মরবে, ঘর পুড়বে, সম্পত্তি লুট হবে। আমার ধারণা ছিল এটা শুধু গুণ্ডাদেরই কাজ। কিন্তু ইতিমধ্যে নানা সূত্রে জানতে পেরেছি ভদ্রলোকের ছেলেরা, এমন কি বড়রাও এতে লিপ্ত। এ জাতিকে বাঁচাবে কে? গুণ্ডাকে কেমন করে দমন করতে হয়, সেটা জানা। কিন্তু এই শ্রেণীর অপরাধীদের শাসন করার কৌশল অজানা। আমরা লেখকরা দমন বা শাসনকর্মে অক্ষম। উদ্ধার কর্মে অসমর্থ। আমরা বড়জোর লিখতে পারি, লিখে অপ্রিয় হতে পারি। তাই বা ক'জন হতে রাজী? লেখকদের হাতে অন্য কাজ। সৃষ্টির কাজও তো কাউকে না কাউকে করতে হবে। শিল্পী যেন গর্ভিণী নারী। তাকে গর্ভ রক্ষা করতে হবে। যেখানে ঘোরতর অন্যায় সেখানে সে নীরব বা নিষ্ক্রিয় থাকলে তারও বিবেকে বাধে, কিন্তু সে যদি তার গর্ভ রক্ষা না করে সেটাও কি কম ভাবনার কথা।

আমার নমস্কার নিন। ইতি। ভবদীয়

অন্নদাশঙ্কর রায়

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

# গোলাপ হয়ে উঠবে

(পূর্বানুবৃত্তি)

(সেই রাত্রে প্রবল জ্বরের উত্তাপে শান্তনু জেগে থাকতেও পারল না। আবার ঘুমোতেও পারল না। আর সেই সংশয়িত চেতনার আবছা আলোয় ও কেবল নন্দিনীকেই দেখতে লাগল।) আর ওদিকে অর্ধরাত্রের নন্দিনী নিজের মাদকতায় নিজেই যেন কেমন আত্মহারা হয়ে উঠেছে। সংক্ষিপ্তবসনা নন্দিনী। প্রিয়ব্রতর মধ্যে আহ্বান সৃষ্টি করার জন্য সে আকুল। নন্দিনী সেদিন বিকেলবেলায় সেজেছিল অন্যকে চঞ্চল করে তুলবে এই আশায়। অন্যকে তরল করবে—এই কথাই সে ভেবেছিল। কিন্তু ও যে নিজেকেই চঞ্চল করে তুলেছে—ভিতরে ভিতরে নিজেই কখন গলে গেছে এটা জানতেই পারে নি।

(শান্তনু তার নিজের শয্যায় স্বপ্ন দেখতে লাগল নন্দিনীর আঁচল খসে গেছে।)

তাই সম্ভবত ঘুম আসছে না। সারা পায়ে, বোধ হয় দীর্ঘপথ হাঁটার জন্যেই, কেমন যেন অস্বস্তি। শাড়ির আঁচলটা এক হাতে মুঠো করে অন্য হাতে পাকাতে লাগল। অন্ধকার যেন ওকে শুষে নিচ্ছে। গলা শুখিয়ে কাঠ। প্রিয়ব্রতর বিছানা থেকে দেশলাই জ্বালার শব্দ পেয়ে চমকে উঠল নন্দিনী। প্রিয়ব্রত জেগে আছে।

(সেই অস্ফুট চেতনাতে শান্তনু অনুভব করল নন্দিনীকে তার ভালো লাগছে না।) নন্দিনী নিজের বিছানা ছেড়ে প্রিয়ব্রতর বিছানায় গিয়ে হাজির হল। শান্তনু যা স্বপ্ন দেখছিল তার নিরাসবাব ঘরে জ্বরো উত্তাপের মধ্যে তা হয়তো নেহাৎই তার কামনারই বিকার। কিন্তু নন্দিনী আর প্রিয়ব্রতর জীবনে সেটা সত্য হতে সময় লাগল না।

নন্দিনী প্রিয়ব্রতকে দু-হাতে আঁকড়ে ধরল—তুমি আমাকে একটুও ভালোবাসো না।

খাট থেকে হাত বাড়িয়ে জলন্ত সিগারেটটাকে ছাইদানিতে টিপে নিবিয়ে দিল প্রিয়ব্রত। আর সঙ্গে সঙ্গে তার যেটুকু অস্বস্তি ছিল সেটুকুও মুছে গেল।

ও বলল—তুমি বড় ছেলেমানুষ নন্দিন।

তারপর প্রিয়ব্রতই অন্ধকার হয়ে ঢেকে দিল, ঘিরে ধরল, পরিপূর্ণ করল, অনাবৃত নিশীথিনীর মতো নন্দিনীকে।

খানিকক্ষণ বাদে স্খলিত পায়ে নন্দিনী আবার নিজের বিছানায় ফিরে এল। শাড়িটা গুছিয়ে পরল। ভেঙে-যাওয়া খোঁপাকে বেঁধে নিতে গিয়ে দেখল ঠিকমতো বাঁধা যাচ্ছে না। প্রিয়ব্রতও সিগারেটটা আবার ধরাল। শান্তনুর স্বপ্ন কখন গলে গিয়ে মিশে গেল ঘুমে। হেমন্ত রাত্রির শিশিরফোঁটা পাতায় পাতায়। তারারা নিঃশব্দে যে যার স্থান পরিবর্তন করতে লাগল। ঘুমোতে ঘুমোতে নন্দিনীর চোখে দু-একটা ফোঁটা জল আসি আসি করেও এল না। এই রকমই হয়। এই রকমই হবে। যে কথা কোনো দিন নন্দিনী ভাবত না, ভাবতে চাইত না সে কথা ভাবল—আমি মেয়েমানুষ, আমার নিজের হাতে কোনো উপায় নেই। আমার মা যেই হোক, বাবা যে আদর্শই ধারণ করে থাকুন না আমার সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। আদর্শ—ওসব কথা কি আমারই বলার কোনো অধিকার আছে? আমিও তো নিজের লোভ সামলাতে পারি না। তাহলে এ কথাও ভাবি না কেন যে প্রিয়ব্রতও প্রিয়ব্রতর লোভের কাছেই অসহায়। ঘুম—ঘুম—যে ঘুমের জন্য তার সমস্ত রোমকূপ আকুল—তার চোখের পাতায় শুধু সেই ঘুমের দেখা নেই……

( শান্তনু ঘুমোতে পারল না। জেগে থাকতেও পারল না—জ্বর—জ্বর—সকল সত্তাই যেন জ্বরগ্রস্ত। )

## সপ্তম অধ্যায়

সেদিন বিকেলটা ছিল অসামান্য বিরস।

শীতের কুয়াশা নদীর জল ঢেকে ফেলেছে। নিমগাছের ঝুঁকে-পড়া ডালে বিবর্ণ হলুদ পাতারা স্থির হয়ে অপেক্ষা করছে কখন একটা দমকা হাওয়ার ঝাপটা এসে লাগবে। মরা রোদ সাপের অর্থহীন খোলসের মতো এখানে



ওখানে লেগে রয়েছে। সুব্রত একা একা এলোমেলো ঘুরছিল। সন্ধের দিকে একটা জায়গায় কজনে একবার বসবে কথা আছে। অনেকেই আসবে। শান্তনু, রুচিও আসবে। রমেনের স্মৃতি-সভার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। দেরি আছে খানিকটা। গঙ্গার ধারে পায়চারি করছে, ভাবছে রুচিদের বাড়িতে কয়েক দিন আগের অভিজ্ঞতা। রুচির মা বাবা হঠাৎ সুব্রত সম্বন্ধে বড় সচেতন হয়ে উঠেছেন। অত বড় বাড়িটা প্রিয়ব্রতর কথায় বেচে ফেলা ঠিক হবে না—রুচির মা প্রকারান্তরে এই পরামর্শ দিচ্ছিলেন।

কেন দিচ্ছিলেন? আর দিচ্ছিলেনই যদি রুচি কেন অস্বস্তি বোধ করছিল? রুচির বাবা কেন অমৃতবাজারের আড়ালে মুখ ঢেকে প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছিলেন? সুব্রত মিনমিন করে বলেছিল—ঠিক করতে পারছি না কিছু।

—এর আবার ঠিক করার কী আছে। তুমি পার্টিশন করে নাও। কী বল? রুচির মা রুচির বাবার দিকে তাকালেন। রুচির বাবা কাগজ থেকে মুখ তুলে কিছু বলতে গিয়ে দেখলেন শ্লেষ্মা বেধে রয়েছে গলায়। গলা ঝেড়ে—অ্যাঁ, মানে—

রুচির মা বললেন—না, তোমার অংশ তুমি বেচবে কেন? আজ না হয় তুমি একা আছ। চিরদিনই যে তাই থাকবে তা তো নয়।

ভালো লাগছিল না রুচির মায়ের এই অযাচিত অভিভাবকত্ব। রুচি হয়তো বুঝতে পারছিল। কথা ঘোরাবার চেষ্টা করছিল ও। হঠাৎ মনে হল সুব্রতর রুচির মায়ের কথার আড়ালে কোনো অনির্দেশ্য ইঙ্গিত উঁকি দিচ্ছে কি? যে অধ্যাপক ছেলেটিকে এঁরা সংগ্রহ করেছিলেন রুচি অকস্মাৎ সেখানে না বলে দিয়েছে। এবং না বলে দেওয়ার গল্পটা রুচি স্মিত মুখে সুব্রতকে বলেছে। তারপর সহাস্য মন্তব্য করেছে—নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারলাম দেখেছ সুব্রতদা। সেদিনই বিশেষ করে লক্ষ্য করেছিল সুব্রত যে রুচি তাকে তুমি বলছে। সুব্রতর ভালো লেগেছিল। হাঁটতে হাঁটতে গঙ্গার ধার ছেড়ে পাড়ার মধ্যে ঢুকল। কিন্তু সে ভালো লাগার সীমা ভালো লাগাতেই সীমাবদ্ধ। রুচিদের পক্ষ থেকে যদি এর অর্থকে আরো বিস্তারিত করে তোলা হয় তাহলে?—না, সুব্রত যেন রটনাকে ঘটনা করে না তোলে। আজই রমেনের স্মৃতি-সভা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের দিনে আরো

বেশি করে কথাটা স্থব্রতর মনে হল। সে ঠিক করল রুচিদের বাড়ি যাওয়া কমিয়ে দেবে।

এইসব নানা কথা ভাবতে ভাবতে স্থব্রত পায়চারি করছিল। অনেক বাড়িতে উন্থনে আঁচ পড়েছে। একটা গলির মধ্যে ঢুকল ও। দুধারের বাড়ি থেকে ছোট ছেলেদের পড়ার আওয়াজ ভেসে আসছে। কয়লার উন্থনের ধেঁায়ায় গলির বুকে দম-বন্ধ হাঁপানি। চোখ জ্বালা করে। একটা জায়গায় পলস্তারা খসে যাওয়া একতলা একটা বাড়ির ভাঙা রোয়াকের সামনে একটা ভীড় দেখে স্থব্রত থামল। বড় রাস্তার ভীড় হলে সে হয়তো দাঁড়াত না। গলির ভীড় বলেই সে দাঁড়াল। কে একটি মেয়ে গলায় দড়ি দিয়েছে। কেউ কেউ দেখেছে মেয়েটির মৃতদেহ। কেউ দেখেছে এইতো একটু আগে সে বাইরের জল-কলে জল নিতে এসেছিল। পাড়ার মাতব্বরেরা পুলিশের কথা বলছেন। এ পাড়ার মেয়ে নয়। ওরা পাকিস্তান থেকে এসেছে। একটা ঘর ভাড়া করে একটা পুরো পরিবার এসে উঠেছিল। মেয়েটির বিয়ের কথা হতে হতে দু-দুবার ভেঙে গেছে। একবার সে দেশে। একবার এ দেশে। কিন্তু ভেতরের কথা কে জানে মশাই। সন্ধেবেলায় মেয়েটা যে বেড়াতে যেত, কোথায় যেত? লাস নিয়ে যাবে পুলিশে। হ্যাঃ ও লাস আটকাতে হলে একশটি টাকা গলে যাবে। সেই ধেঁায়া-ধেঁায়া অন্ধকারে কিম্ভূতকিমাকার ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্থব্রত দুটো বারো তেরো বছরের ছেলের কথা শুনতে লাগল আনমনে—

: দেখবি না?

: দেখেছি, ঝুলছিল তখন। কষ দিয়ে রক্ত না পানের পিক গড়িয়ে পড়ছিল।

: এ কেরে হাঁদুমণি, মরার আগে লোকে পান খায়?

: খায় না বান্টুর মা আলতা পরে, পান খেয়ে সিঁদুর পরে পুকুরে ঝাঁপ দেয়নি?

: হৃদয় খুড়ো কিরকম বোল ছড়াচ্ছে দেখছিস?

: ছড়াবেই তো, ওর বাড়ি ভূতের বাড়ি হয়ে গেল না? কে ভাড়া নেবে আর?

: কে নেবে? যারা রয়েছে ওদের কাছ থেকেই খুড়ো ওই বলে ভাড়া বাড়িয়ে নেবে।



: কে দেবে পয়সা আর, শুনছিস না মেয়েটাই তো পয়সা আনত, ওদের ব্যাটাছেলেরা তো সারাদিন বসেই থাকে।

: সবাই বলছে মেয়েটা বেঁচে থাকলে মেয়েটার নাকি ছেলে হত।

: গাঁজা। বিয়ে না হলে মেয়েদের ছেলে হয় না।

: খারাপ মেয়েদের হয়।

গলির মাথায় ছোট দারোগা সাইকেল থেকে নামলেন। পিছু পিছু একটি সিপাই। ভীড় ঘন হয়ে উঠল। স্থব্রত আর দাঁড়াল না। এগিয়ে যেতে যেতে শুনতে পেল একটি কেসো বুড়োর গলা—ও মশাই শুনে যান না, কী বুঝলেন···কেউ দাঁড়াচ্ছে না তার কথা শুনে, রোয়াকের ধারে জানলায় মুখ বাড়িয়ে বুড়ো বিরক্ত হয়ে মন্তব্য করছে—বুড়ো বলে একটা ভদ্দতাই নেই। হেঁপো মানুষ নড়তে পারি না, এত বড় ব্যাপারটা, তা কেউ যদি···বুড়োর দিকে তাকাতে গিয়ে স্থব্রত হঠাৎ একটা কুকুরের ল্যাজ মাড়িয়ে ফেলে লাফিয়ে উঠল। গলিটা ছেড়ে তাড়াতাড়ি বেরুতে পারলে যেন বাঁচে সে। পুলিশ লাস ছেড়ে দিক অথবা নিয়ে যাক এখুনি গলিটায় মড়াকান্নার ঘোলাটে স্থর বাজতে থাকবে। গলিটার নাম মনসাতলার গলি। ঘুরে ঘুরে ঘোরালো হয়ে সরু গলিটা যেন অন্ধকারেই মিশে গেছে শেষটা। দু-পাশে নোনাধরা দেওয়াল। খোলা নর্দমা। লণ্ঠনের অথবা তেলের কুপির ম্লান আলো। দু-পাশে ব্যর্থতা—গ্লানি—গঞ্জনা। কদিন আগে শান্তনুকে সঙ্গে করে ফটিকদার ওখান থেকে ফিরতে ফিরতে মমতাদের কথা ভাবতে ভাবতে ওর ঠিক এইরকম গ্লানি বোধটাই জেগেছিল। ফটিকদা শান্তনুকে বুকের প্লেট নিতে বলেছেন। মমতা নামে সেই মেয়েটির গল্প শুনিয়েছেন। মমতার বাবা মমতাকে ফেলে রেখে বাইরে পড়ে থাকে। বাড়ি ফিরে মমতাকে ঠেঙায়। মমতাকে চিকিৎসার স্থত্রে ফটিকদা ও ফটিক-বৌদি মমতার কাছে বার দুয়েক গিয়েছিলেন। মেয়েটি অনুনয় করেছে এঁদের আপনারা আমার জন্যে কিছু করবেন না। বাবা পছন্দ করেন না। ফটিক-বৌদি বললেন,—মমতা কাঁদে না। নিঃশব্দে মার খায়। পাড়া প্রতিবেশীরা কেউ যদি মাথা গলায় তো সে বিরক্ত হয়।

আজ এই অচেনা মেয়েটির আত্মহত্যার কথা ভাবতে ভাবতে স্থব্রতর মমতার কথাটাই বিশেষ করে মনে পড়ল। ফটিকদার জন্যে কী একটা

বুনতে বুনতে ফটিক-বৌদি বলেছিলেন—মমতাদের ব্যাপার ঠিক ডিসপ্লেসড পার্সনদের ব্যাপার নয়।

কুমিল্লায় একটা ব্যাঙ্কে কাজ করতেন শ্রীনাথবাবু—মমতার বাবা। শ্রীনাথবাবু বিয়ে করেছিলেন পাড়াগাঁয়ে। সাধারণ গেরস্থর ঘরে। মালতী শ্রীনাথবাবুর স্ত্রীর নাম। মমতার যখন বছর পাঁচেক বয়স তখন মালতী শ্রীনাথবাবুকে ছেড়ে চলে যায়।

—কেন যায়? সুব্রত জিজ্ঞাসা করেছিল।

—মমতার সেটা আমাকে বলার কথা নয়, বলেও নি। জানে, অথচ বলেনি আমিও আর—সে আজ বছর দশেকের কথা। ওর বাবা চাকরি ছেড়ে দিয়ে বৌকে খুঁজেছেন দীর্ঘদিন।

—পান নি নিশ্চয়?

—মমতাকে এসব জিজ্ঞাসা করা যায় না। মেয়েটা বাচ্ছা হলে কী হবে, খুব শক্ত। সম্ভবত এ-জাতীয় কৌতুহলের সম্মুখীন হতে হতেই ওর অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে। তবে মনে হয় ওর বাবা একটা হদিস কিছু করেছেন। কিন্তু তাতে কোনো লাভ নেই আর। এখন আর কিছু করার নেই ভদ্রলোকের —নেশা করা আর মেয়ে-ঠ্যাঙানো ছাড়া।

ফটিকদা বললেন—আমার মিসেস দেখতে চাইছিলেন মেয়েটাকে নিজের দানশীলতার ছত্রছায়ায় টেনে আনা যায় কিনা। কিন্তু দেখা গেল সে বড় কঠিন ঠাঁই।

সেদিনও এইরকমই বিষণ্ণ মন নিয়ে সুব্রত বাড়ি ফিরেছিল। বন্যার দুর্যোগে দেখা মেয়েটির বিশীর্ণ সুন্দর মুখশ্রী, জট-পাকানো অবিন্যস্ত চুলের ঢাল আর তার দুর্ভাগ্যের কথা তার বারে বারে মনে পড়েছিল। আজো অনুভূতি তার একই। মমতা—শান্তনু—এই অচেনা মেয়েটি—চারিদিকে শুধু ক্লান্তি আর ক্লান্তি। শান্তনুর বুকের প্লেট নিতে হবে। সেদিন ফটিকদা ও ফটিক-বৌদি যতক্ষণ মমতার গল্প বলে যাচ্ছিলেন—জরোত্তপ্ত লালচে মুখে উদ্‌ভ্রান্ত চোখে শান্তনু ঘরের ভেন্টিলেটারের দিকে তাকিয়ে ছিল। কী অন্তহীন শ্রান্তি শান্তনুর ঘাড় এলিয়ে বসে থাকার ভঙ্গিতে। কী যে হল সেদিন রুচি আর শান্তনুর মধ্যে, ওরা এ ওর সম্বন্ধে কথা উঠলেই কেমন গম্ভীর হয়ে যায়।

পথে যেতে যেতে সুব্রত দেখল গঙ্গার ধারে ফিলটার হাউসের পাঁচিলের



কাছে আবছা অন্ধকারে কতকগুলি লোক মোমবাতি জ্বালিয়ে তে-তাস খেলছে। মোমবাতির তেরছা আলোয় ওদের একজনকে দেখে মনে হল সে একটু ফরসা হলে প্রিয়ব্রতর মতো দেখতে হত। প্রিয়ব্রতরা চলে গেছে। নন্দিনী আর কোনো গোলমাল করে নি। যাবার দিন স্বচ্ছন্দে সুব্রতকে প্রণাম করে হাসিমুখে প্রিয়ব্রতর সঙ্গে বেরিয়ে গেছে। আগামী সপ্তাহে বাড়িটা এক সাহা ভদ্রলোক কিনবেন। ওঁরা ঢাকা জেলা থেকে আসছেন। নন্দিনীর প্রতিরোধ সুব্রতর চোখের সামনেই গলে গেল কিছু না—কিছু মনে করে নি সুব্রত। নন্দিনীর বিরুদ্ধে তার মনের মধ্যে কোনো অভিযোগ নেই। সে কি দেখে নি কেমন করে উত্তাপ জুড়িয়ে নিতে হয়। জুড়িয়ে যাওয়া-না-যাওয়ার প্রশ্ন নয়। উত্তাপের সঙ্গেও আপোষ করে নিতে হয়। ভারতবর্ষের কমিউনিস্টরাও কি তাই করল না? গোঁড়া বিপ্লবী দর্শনের নৈষ্ঠিক শিষ্যরাও যদি মানিয়ে নেয়, এক পা এবং দুই পায়ের এগুনো পেছুনোয় যদি সব পশ্চাদপসরণের ব্যাখ্যা হয়ে যায়—নন্দিনীর এটাও তো তাহলে কিছু নয়—ওয়ান স্টেপ ব্যাকওয়ার্ড হওয়া মাত্র।

সবাই কি মানিয়ে নেয়? অবজেকটিব কণ্ডিশনের কথাই এ ভাষায় না হয় ও ভাষায় সবাই বলে। রুচি বলে। নন্দিনী বলে। দেবুকে বলতে শুনেছে। মমতাও হয়তো বলে। শুধু কি এই মেয়েটাই বলল না—গলায় দড়িটাই তার সোজা মনে হল? না কি সেও অবজেকটিব কণ্ডিশনের নির্দেশই মেনে নিল? মিউনিসিপ্যালিটির আলোগুলো কুয়াশায় বিবর্ণ। নদীর বুক থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। পথে লোক চলাচল কম। মুড়ি-সুড়ি দেওয়া সন্ধ্যা। ঘুরতে ঘুরতে সুব্রত আবার সেই গলিটার মুখে এসে দাঁড়াল। পুলিশ চলে গেছে। ভীড় সরে গেছে। মেয়েটির হাতে লেখা চিঠি ছিল। পুলিশ লাস ছেড়ে দিয়েছে। এবং এতক্ষণের থমকে-থাকা কান্না যেন এতক্ষণ থমকে থেকেই ক্লান্ত হয়ে গেছে। সুব্রতর মনে হল অস্বাভাবিক—সবই অস্বাভাবিক—এমন কি এই ক্লান্ত ভীত কান্নাটাও অস্বাভাবিক।

এই গলির শেষে একটা একতলা বাড়ির ভেতরের দিকে একটা টিনের চালাঘরে ওদের বসবার কথা। সুব্রত দেখল বাইরের ঘরে লণ্ঠন জ্বালিয়ে ঝুঁকে পড়ে একজন কাগজ পড়ছে। সুব্রত দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। লণ্ঠনের ওপার থেকে ভ্রূ কুঁচকে লোকটি জিজ্ঞাসা করল—কে? সুব্রত এগিয়ে যেতে বলল—আসুন। নস্যি রঙের আলোয়ানের আড়াল থেকে মুখ বার করল না।

—সবাই এসেছে ?

—রুচিদি এসেছেন শুধু। এই এসে পড়বে সব। সবে তো সময় হল।

কাঁচা মাটির উঠোন ডিঙিয়ে একটি লম্বা চওড়া ঘরে ঢুকল সুব্রত। একটা বিচালি-কাটা মেসিন রয়েছে ঘরের একপাশে। হাতে চালানো মেসিন। তার নিচে স্তূপাকার বিচালির কুচো। মাটির মেঝে। ঝাঁট দিয়ে ভদ্রস্থ করা হয়েছে। একটা চটও পাতা হয়েছে তার ওপর। ঘরের দুটো খুঁটির সঙ্গে বাঁশ বেঁধে গোটা দুই লণ্ঠন জ্বালানো হয়েছে। আলো দুটোর দু-রকম রঙ। একটা লাল কেরোসিনের আলো। আর একটা শাদা কেরোসিনের। এই আলোটার নিচে খুঁটি ঠেস দিয়ে বসে আছে রুচি।

সুব্রত জিজ্ঞাসা করল—কতক্ষণ ? চমকে উঠল রুচি। একটু যেন নার্ভাস গলায় বলল—সময় হল, বাবাঃ কী কাণ্ড সব। কতক্ষণ একা এসে বসে আছি। অচেনা জায়গা।

গায়ের চাদরটা খুলে রাখল সুব্রত। রুচির দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে না তাকিয়ে সে পারল না। একটা লাল রঙের শীতের সোয়েটার পরেছে রুচি। সব বোতামগুলো আঁটা যায় নি। অথবা আঁটে নি। কিন্তু এই ঘরে—আজ—এই সভায় রুচির বুকের প্রগলভ উচ্ছ্বাস বেমানান হবে না ? সুব্রত ঠিক করল আজ রুচির পাশে সে বসবে না, দূরে বসবে। আজ রুচিকে একা বসতে দেওয়াই ভালো। রুচির মুখ-চোখ থমথমে। সুব্রত জিজ্ঞাসা করল—কী হয়েছে ?

রুচি জবাব দিল—আক্কেল দাঁত উঠছে।

একটা মাঝারি গোছের মাটির সরায় দেখতে দেখতে অনেকগুলো বিড়ির টুকরো জমে উঠল। একটা পান বিড়ির দোকানের মতো ঝোলানো দড়ি বেশ খানিকটা পুড়ে গেল। কিছু শ্রমিক, মাফলারে কাণ মাথা ঢাকা, কিছু জহরকোট পরা ছাত্র, কিছু স্কার্ফ ঢাকা মহিলা—একজন ডাক্তার ( ফটিকদা ), কয়েকজন শিক্ষক—ঘরখানাকে এবারে রীতিমত ছোটই মনে হচ্ছে। ধুলোয় আর ধোঁয়ায় দমবন্ধ হবার মতো অবস্থা।

পার্টির সরকারী নীতি আনুষ্ঠানিক ভাবে এখনো বাতিল হয়ে যায় নি। কিন্তু সে নীতির সমালোচক যারা তারা অনেক মুখর হয়ে উঠেছে। সরকারী নীতির সমর্থকেরা আন্তর্জাতিক প্রতিকূলতায় বেশ খানিকটা হতভম্ব হয়ে



গেছে। আর কারো কারো মধ্যে একটা কিম্ভূতকিমাকার ভয় বা সন্দেহ মাথা চাড়া দিয়েছে—গোপন মিটিঙের সব ব্যক্তিগত বক্তব্য গবর্নমেণ্টের গোয়েন্দা বিভাগ জানতে পারে। কাজেই তারা কিছুটা বোবা। অনেকেরই মনের ভাব যাই হোক মুখের ভাব, আমরা তো আগেই বলেছিলাম। শুধু মানব বেশ মানিয়ে নিয়েছে। আসনপিঁড়ি হয়ে মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বসেছে।

…কাজেই চীনের পথ আর ভারতবর্ষের পথে তফাৎ থাকবেই। ( মানব বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ নয়। )

…কেন ?

…চীনের অবজেকটিব কণ্ডিশন আর ভারতবর্ষের অবজেকটিব কণ্ডিশন এক নয়।

…কমরেড অবজেকটিভ কণ্ডিশন, একটা—

…এ সম্বন্ধে আপনি কিছু তথ্যমূলক ভাবে জানেন ?

…শুনুন—

…( পানের পিকটা বাইরে ফেলে আসুন আগে )

রাজনৈতিক রিপোর্টিং-এর এই ক্লান্তিকর অধ্যায়টা কিছুতেই কমরেডরা সংক্ষিপ্ত করতে জানে না। অথচ কেউ কেউ কেমন প্রশান্ত ধৈর্য নিয়ে শোনে। যেমন মানব। সুব্রতর চিরদিনই মনে হয় কমে সারা যায়। সমস্তটা বলা শেষ হতে এখনো তিন কোয়ার্টার। রুচি গালে হাত দিয়ে বসে আছে। খইনি ডলছে দুখনাথ। সুব্রত হাত বাড়িয়ে দুখনাথের কাছ থেকে এক চিমটে খইনি নিল। প্যাণ্ট পরে মাটিতে বসতে ফটিকদার অসুবিধা হচ্ছে। বার বার বসার ভঙ্গিটা পাল্টাচ্ছেন। ফটিকদার স্ত্রীও এসেছেন। অসামান্য সুন্দরী। মানব ফোলিও ব্যাগ থেকে একটা সাইক্লো করা কাগজ পড়িয়ে শোনাতে লাগল।

…তাহলে আমরা কি এখন ইলেকশন লড়ব ?

…সে ক্ষেত্রে এত দুর্ভোগের দরকার কি ছিল।

…ব্যাপারটা তা নয়। সবটা এখনো—

…ঠিক করে ভাবা হয় নি। সেণ্ট্রাল কমিটির স্তরে আলোচনা চলছে।

…তবে আর উর্বশীকে চিৎপুরের গণিকা বলা হবে না ? একটি কোণ থেকে শান্তনু বলে উঠল।

…থামো হে এ সভায় মেয়েরা আছে। ফটিকদা ধমক দিলেন।

…সে কি আপনি ও-সব বুর্জোয়া চক্ষুলজ্জা মানেন ?

একটা হট্টগোল বেধে গেল। সবাই মিলে আবার থামাল। কেউ কেউ লবি করতে লাগল পাশে সরে গিয়ে। লবিটার সারমর্ম হঠাৎ উচ্চকণ্ঠ হয়ে উঠল—অনেক হারিয়েছি আমরা, হারিয়েছি কি না ?

—জরুর। আলবত। ইউনিয়ন আগে একঠো এলান দিলে হাজারো মজদুর সামিল হয়ে যেত। যো কুছ সওয়াল হো পার্টি নাড়া তুললে খলবলি পয়দা করা তো উস টাইমমে সিধা বাত ছিল। লেকিন এখন কি হয়েছে ? ইউনিয়ন অফিসকো চারো তরফে কোই আসে না, অফিসমে ঘুসনা তো দুসরা বাত। ডরপোক করে দিয়েছে কারা ?

আবেগে দুধনাথ আরো দুর্বোধ্য হয়ে উঠছে যেন। সুখদেও বলল—জুটার হাওার মাফিক ইউনিয়ন বাতিল করে দিয়েছে, কসুর কিসকো ?

মানব রুমাল বের করে মাথার ঘামটা মুছলে। নিরুত্তাপ শান্তনু রুচির দিকে একবার তাকাল। দুধনাথ বলে চলল—আপলোক জানেন পার্টিকা বারে কত আদমি জিন্দগী বরবাদ করেছে। আটতিশ সালে মীরাবাগানে সারা বঙ্গালমে সবসে পহেলা চটকল মজদুর পুলিশকো সাথ মোকাবেলা করেছে। ওহি হাঙ্গামায় হামারা দাদাকে একঠো হাথ বরবাদ হয়ে গেল, আউর মজা হামার বাপকো নোকড়িভি ছুটে গেল। বাপ জুয়া খেলতে লাগল। খাঁয়ের কাছে খত লেখে, কিস্তিওয়ালার কাছে লেখে—জুয়াড়ী শালালোকের কাছে লেখে—আমি লঙ্গোটিয়া ছোকরা—পেপার মিলে সড়কসে কাগজ উঠাকে বিক্রি করি। মহাজনকো ডরসে শেষে রাতকো আন্ধেরিমে ছিপায়কে বাপকে সাথ ভেগে গেলাম। পাণিহাট্টিসে হামরা নোকড়ি মিলে চৌচল্লিশ সালে—ওহি সালে সর্দারকো সাথ হাঙ্গামায় নোকড়ি ছুটে ভি গেল। ওহি সালে হামি লালঝাণ্ডা পকড় লিয়া। বিলাকৃর্বোর ব্রার্কার্স ইউনিয়ন বানিয়েছি খুন দিয়ে। আজ ওহি ইউনিয়নকো চাকনাচুর হো গয়া—কসুর কিসকো ?

থম থম করতে লাগল ঘরখানা। দুধনাথ হঠাৎ যেন উপলব্ধি করল যে সে বোকার মতো কথার ঝাঁজ প্রকাশ করে ফেলেছে। হেসে আবহাওয়া ঠাণ্ডা করতে চাইল সে। সুব্রতর কাছে সেটাই মনে হল বোকার মতো হাসি।

মানব বলে চলল—যাই হোক, পার্টির সব থেকে বড় সম্পদ সিয়াসী



খেয়াল—মানে রাজনৈতিক চেতনা। পার্টির অন্দরে—মানে ভেতরে যে একাই মানে ঐক্য তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, এ বিষয়ে কোই দুসরা সওয়াল নেহি, দ্বিতীয় প্রশ্ন নেই।

ভেঙে গেছে, পালিয়ে গেছে, মরে গেছে, নেই, চাকনাচুর হয়ে গেছে। এই কি তাহলে আজকের মিটিং-এর যোগফল—সুব্রত বিমূঢ় হয়ে যেতে বসেছে যেন।

…তাহলে এর পর আমাদের কী করণীয় ?

…সিফ' বোলো খানেকো রোটি দেও, জাড়াকো কমলি দেও—সিয়াসী লড়াইকো বাত ছোড় দেনা ? শান্তনু উঠে দাঁড়াল। এ-কদিনে ও যেন আরো রোগা হয়ে গেছে। তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর সবাই ছাপিয়ে প্রশ্নের আকার ধারণ করল—তাহলে যে সব ছেলেরা রমেনের জন্যে শহিদ স্মৃতি-সভা করতে চাইছে তাদের বারণ করে দেওয়া হোক ?

…কেন ?

…কাহে, কিস লিয়ে ?

—রমেনের কথা, তার বাঁচা মরার কথা এখন যত চেপে যাওয়া যাবে তত অপ্রিয় প্রসঙ্গের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে—তাই না ? তাছাড়া রমেন তো দেখা যাচ্ছে ভুল চিন্তার জন্যে মরেছে। ভুল শহিদ নিয়ে কী হবে আমাদের ?

তীক্ষ্ণ শরের মতো বিদ্রূপের খোঁচা সবাইকে লাগল।

মানবের চোখ-মুখ দেখে মনে হল সে আর ধৈর্য রাখতে পারবে না। তবুও অনেকখানি শান্ত হবার চেষ্টা করল সে। বলল—না, মোটে আমরা তা বলতে চাচ্ছি না ? আমাদের ট্যাকটিকস-এর কথাটা ভাবতে হবে, শুধু এই কথাটাই আমি বলতে চাচ্ছি। রমেনের মৃত্যুর স্মৃতি আমরাই ধরে রাখব, আমরা যারা মরতে ভয় খাই না তারাই।

রুচির জিজ্ঞাসা চাবুকের মতো ফুঁসে উঠল—তাহলে আমরাই বা ধামাচাপা দিতে চাচ্ছি কেন ?

—চাপা দেবার প্রশ্ন নয়, সমীচীনতার প্রশ্ন।

—কাদের কাছে এ প্রশ্ন ? রুচি যেন থামতে চায় না।

সুব্রত বলল—না, সমীচীনতার প্রশ্নও এ নয়।

…উঠে দাঁড়িয়ে বলুন।

চাদরটা ফেলে রেখে উঠে দাঁড়াল সুব্রত।

—ভুল অথবা ঠিক, এ বিচার কে করে? করার মালিক কে?

শান্তনু বলল—সাফল্য। সফল যখন হই নি, তখন ধরে নিতে হবে আমরা ভুল।

সুব্রত বলল—ব্যঙ্গ করার কোনো মানে হয় না, কেন না একটা কথা ঠিক যে ভুল আমরা করেছি। ভুল করা অস্বাভাবিক নয়, ভুল সংশোধন না করাটাই অস্বাভাবিক।—প্রায় মুখস্থ বলে গেল সুব্রত।—কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে রমেন কি, ভুল করছে জেনেই মরেছে, না, তার উদ্দেশ্যের সঙ্গে অভেদ থেকেই সে মরেছে? ভুলটা ভুলই। সেটা অপরাধ নয়। পার্টি মেসিনারিকে কবজা করব এই ভাবনাটাই যেখানে বড় সেখানে ঐ চিন্তাই অপরাধ—যেমন নতুন পার্টি-লাইনে যদি এই চিন্তাই নতুন আকারে কারো মাথায় ঢোকে সেটাও অপরাধ। কিন্তু যদি জনসাধারণের স্বার্থের প্রশ্নটাই প্রধান হয় তাহলে ভুলের আকার-প্রকার পাল্টে যায়। রমেনের মৃত্যুর মধ্যে কোনো ভুল নেই। সে মৃত্যুর ভিতর দিয়ে আমাদের ভুলটা ধরিয়ে দিয়েছে। আর, প্রমাণ করেছে যে সে নিজে একজন সৎ মানুষ ছিল।

শান্তনু আবার উঠল—আমরা আমাদের আচরণে যদিও এর উল্টো সাক্ষ্যই দিচ্ছি। অস্ফুট স্বরে রুচি বলল—মানে কি তোমার কথার?

—তোমরা সকলেই সে কথা বেশ জানো। এই বলে শান্তনু উঠে দরজার কাছে গেল। চটি পরবার জন্যে ফিরে দাঁড়িয়ে সে বলল—আমরা কেউ বুকে হাত রেখে কথা বলি না।

শান্তনু চলে যাবার পর সুব্রত বসে পড়ল। মানব জিজ্ঞাসা করল—তাহলে?

ফটিকদা বললেন—তাহলে আবার কী? আমরা প্রথম প্রকাশ্য জনসভা যেটা আমাদের নামে ডাকব সেটা আমরা রমেনের নামেই ডাকব। সেটা তারই স্মৃতি-সভা হবে।

ঠিক—ঠিক কথা—জরুর—ঠিক বাত।

ছেলেরা বলল—আমরা প্রস্তুত। আমাদের শিল্পী, রমেনের একটা বুক পর্যন্ত ছবি এঁকেছে সেটা বাঁধাবার ব্যবস্থা হোক। প্রথম মিটিঙে সভাপতির চেয়ারে ঐ ছবিটাই থাকবে।

—কোথায় সে ছবি?



একটি খদ্দরের গেরুয়া-চাদর মুড়ি-দেওয়া ছেলে উঠে দাঁড়াল। গোল করে পাকানো একটা বেশ বড় কাগজের প্যাকেট হাতে আলোর দিকে এগিয়ে গেল সে। আর দুটি ছেলের সহায়তা নিয়ে মেটে দেওয়ালে ছবিটাকে সে আটকিয়ে দিল। তখনো বোধ হয় একটু আধটু কাজ বাকি ছিল—ছেলেটি পকেট থেকে পেনসিলের টুকরো বের করে এখানে ওখানে ঘষতে লাগল। লণ্ঠনের ম্লান আলোয় রমেনের ধূসর ছবিটার দিকে তাকিয়ে সারা ঘরটা এদিকে স্থির হয়ে গেল। শুখনো মুখ, দৃঢ় চোয়াল, অনেকখানি কপাল—মানুষটা যেন সবাইকে বোবা করে দিয়েছে।

মৃদুস্বরে ফটিকদা বললেন—উঠে দাঁড়াও সবাই। আর কোনো তর্ক নেই, প্রশ্ন নেই। সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল। কে যেন বলল—একেবারে রিএ্যাল।

আর একটা অচেনা গলা বলল—হি ইজ নট ডেড্, হি ইজ উইথ আস।

রুচি ছবির দিকে নয়—সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। সকলে আবার শান্ত ভাবে বসে পড়লে সুব্রত বলল—একটা গান হোক। কেউ রাজি নয়। সকলেরই মধ্যে কেমন একটা স্তব্ধতা এসেছে। ফটিকদা রুচিকে বললেন গাইতে। রুচি বলল, কী গাইব? কে জবাব দিল—যা ইচ্ছে। "আমি যে এসব গান জানিনে।" "যা জানো তাই হোক।"

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে, অনেক ভেবে, কিম্বা হয়তো কিছু না ভেবেই রুচি ধরল—আমার সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটবে গো ফুল ফুটবে—আমার সকল ব্যথা রঙিন হয়ে গোলাপ হয়ে উঠবে। সমস্ত ঘরখানা এখন মনে মনে বিভিন্ন ভাষায় ঐ একটা কথাই বলছিল। সুব্রত আবার বুঝল যে বেদনাই সাম্যবিধায়ক—বেদনার কাছেই সকলে সবকিছু মুলতুবি রাখতে পারে। সুব্রতর নিজেরও তো রমেনের সঙ্গে কত রূঢ় তর্ক বিতর্ক হয়ে গেছে। সুব্রতর মধ্যে রমেন কতদিন আইসোলেশনিস্টকে প্রত্যক্ষ করেছে, সুব্রত দেখেছে রমেনের মধ্যে পলিটিক্যাল টেররিজমের হতাশাকে—তবু সে রমেনের মধ্যে কখনো হেয় ছলনাকে মাথা তুলতে দেখে নি। স্তব্ধ হয়ে-যাওয়া মিটিঙ। গান শেষ করে রুচি এতক্ষণে ছবিটার দিকে তাকিয়েছে। সুব্রতর ডাকতে ইচ্ছে করছিল রুচিকে।

মিটিং শেষ হয়ে গেছে।

পথে নেমে রুচি আর সুব্রত কথা বলছিল না। পাশাপাশি নীরবে হাঁটছিল। সুব্রত রুচিকে কথা বলাবার চেষ্টাও করছিল না। গলির মোড়ে সেই আত্মহত্যার বাড়ি থেকে কান্না উঠছে ডুকরে ডুকরে। নির্জন গলি। একলা কান্না—যেন কোথাও সহানুভূতি চেয়ে পায় নি। ধোঁয়া—কনকনে শীত—অন্ধকার—আত্মহত্যা—অপঘাত—দোমড়ানো কান্না—বোবা কান্না—নানা দিক থেকে মুচড়ে যাওয়া এ এক অপরূপ ভারতবর্ষ। এরি মাঝখানে আমাকে সন্ধান করতে হবে তাকে? সুব্রত মনে মনে বলল।

কাকে?

তার নাম কী?—সুব্রত ভাবল॥

(ক্রমশ)



বিষ্ণু দে

## উত্তর

তখন জিজ্ঞাসা করি: কে তুমি? কে তুমি? দুইজনই
নিরুত্তর, চিরকালই নিরুত্তর এরা দুইজনে।
হয়তো জীবিত ব'লে। যেহেতু জীবনে এরা কেউ
ভাবেনি যে, কে সে আর ওই বা কে? স্বচ্ছন্দ নির্জনে
বোধহয় দেখেইনি মুখ পরস্পর, এরা নয় ধনী
বণিক বা শক্তিধর, কোথা সে সময় বা সুযোগ?
দেখে নি নিজেরই মুখ, প্রতিদিন বড়ই দুর্ভোগ।

সাহেব-পাড়ায় দেখি সুন্দর বাগানে শ্যাম পীত
আমের বউল আজ শীতের বিদায়ে উন্মুখর।
এরা কিন্তু নিরুত্তর, আজীবন, আজও নিরুত্তর,
অথবা উত্তর দেয় কানে কানে। কিন্তু সে উত্তর
ডুবে যায়, কারণ শহরে গ্রামে হন্যে দেয় ফেউ।
তবু নাম পথে ভাসে, রাজপথে গলিতে দুস্তর,
কারণ এ গাজী, আর ও দক্ষিণ রায়, এরা মৃত॥

পরভেজ্ শাহিদী

## মুখাকৃতিহীন

অস্থি হাজার ত্বকে ঘেরা
বিষণ্ণতা হাজার ওষ্ঠ তুলে
তৃষ্ণা হাজার পর্দায় ঢাকা
তাচ্ছিল্য, হাজারো অছিলায়

গর্ব হাজার ভঙ্গী নিয়ে
বিনয়ও হাজার ভঙ্গিমায়
চেতনার পাক সহস্র
মূঢ়তার গ্রন্থি অগাধ

নীরবতারও সহস্র স্বর
জীবন সহস্র মৃত্যুর রূপে
হীনমন্যতার উত্তেজনা উচ্চাভিমানের পরতে বাঁধা

এ ছিন্নভিন্ন মানুষ
এ টুকরো-টাক্‌রা মানুষ
এই সহস্রাকৃতি মানুষ
লোভের অর্থনীতির সাজান বিশৃঙ্খলা—
অশেষ যন্ত্রণা মূর্তিমান—
বল্গাহীন সমাজের অনুপম সৃষ্টি !

এই হাজার আকৃতির মানুষ
আপন আকারের খোঁজে
এখানে-ওখানে-সেখানে, ঘোরে
দিগ্বিদিকহীন, দিশাহারা
আত্মগর্বের মলিন চাদর গা'য়



তারা এখানে-ওখানে
পালায়
তার আপন আকৃতি হাজার চেহারার ভীড়ে
গিয়েছে হারিয়ে
পেতে পারে কি খুঁজে ?

আয়নার সহযোগও বৃথা
দর্পণও অতলস্পর্শী
আপন অসংখ্য চেহারার ভীড়ে
দৃষ্টিও পড়ে ঘূর্ণাবর্তে

কোনও ছবিরই আর বৈশিষ্ট্য নেই
কোনও ছায়াও
বিশ্বাসযোগ্য নয়

এই অসংখ্য আকৃতির মানুষ
অসংখ্য আকৃতি ব'য়ে
ছুটছে, পালাচ্ছে, অজ্ঞাতসারে, নিজেরই
কোথায়, আপন রূপ কোথায়—
সেই সত্য মুখাবয়ব, যে মুখ
পড়ে আছে ছিটকে, কাঁদছে, এই অসংখ্য আকৃতির ভীড়ে।

[ মূল উর্দু থেকে কবির সহযোগিতায় অনুবাদ : সিদ্ধেশ্বর সেন ]

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

## মানুষের নামে

সাদা কালো হলদে বাদামী নানা রঙের মানুষ
শিশু বৃদ্ধ যুবক যুবতী
দেশে দেশে
যারা পাখির চেয়েও বড় প্রতীক্ষায় নীড় বাঁধে
জনক জননী সন্তান সন্ততি-কে নিয়ে

তাদের আমি দেখতে পাই পৃথিবীর সব দেশে
রুশ ভারত চীন আমেরিকা মিশর পাকিস্তান
কংগো কিউবা
যেখানে যখন একটি সদ্যোজাত শিশুর কান্না শুনি
অথবা প্রেমিক প্রেমিকার মৃদু গুঞ্জনে অনুভব করি
একটি রাত ভোর হচ্ছে
তাদের আমি দেখতে পাই

অন্ধকারের মধ্যে ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে। আর
তখনই তাদের মুখে
আমার নিজের নাম শুনতে পাই
বুঝতে পারি আমিও একজন মানুষ, পবিত্র
এবং নিরপরাধ ॥

চিত্ত ঘোষ

## ঘৃণা হত্যা অন্ধকার

যেখানে ঘৃণা হত্যা অন্ধকার জেগে বসে আছে
সেই মৃত্যুপুরীর ভেতর থেকে প্রবল মত্ততা বেরিয়ে এল।

কোথায় কখন খুনের খপ্পরে পড়বে
চারহাতে-পাতা সংসার দশদিক থেকে ছেঁকে ধরবে আগুন
গায়ের জোরে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে বুকের-কাছে-লেগে-থাকা বুক
তাই
মানুষটার কথা বলতে ভয়
ছেলেটার কাঁদতে ভয়
বৌটার নিজেকে ভয়
তাড়া খেয়ে খেয়ে, তাড়া খেয়ে খেয়ে যখন পা মুড়ে আসে
পেছনে শুধু অনুসন্ধানের শব্দ, ছায়া
তখন
আস্তে আস্তে কাঁধে হাত রেখে কে এসে সামনে দাঁড়াল ?
জীবন।
থাকতে দেবে বলে জোর গলায় ডাক দিল কার ঘর ?
ভালোবাসার।
দরজায় দাঁড়িয়ে এদিক থেকে ওদিক পাহারাদার কে গো ?
সাহস।
অতিতামস পরাভূত করে কে আবার আলো ফোটায় ?
শুভময়।

উপাসনার ঈশ্বরের নাম আলাদা বলে
পুড়ে ছারখার সংসার, বাতাসে ছাই ওড়ে।
উপাসনার ঈশ্বরের নাম আলাদা বলে
ঘরগুলো খালি, ঘরগুলো আগুন, ঘরগুলো অঙ্গার

উপাসনার ঈশ্বরের নাম আলাদা বলে
ফলের ঝুড়ি মাথায় নিয়ে মানুষটা সেই যে গেল
আর এল না।

খুঁজে খুঁজে খুঁজে খুঁজে কে কাকে পায়
ফিরে পায়
কি কি হারায় নি, পোড়ে নি
তার তালিকা বানাতে
একই ঘরের দরজা দিয়ে যাওয়া আসা
আর কুহকিনী, সেই আশার মুখ চেয়ে
এ-ঘর ও-ঘর, এ-পাড়া ও-পাড়া
এ-দেশ ও-দেশ।

সারা গায়ে আঘাতের চিহ্ন, পোড়ার চিহ্ন
কাছে বসে আছে হৃদয়।

তরুণ সান্যাল

## লোনা পানির গাঙে

চোখের নিচে তোমরা কারা
চিনতেই পারছি না
চিনতে পারব আর?
তোরা ছিলি কী পাতাবাহার
বনদোপাটি, ভঁাটি
লতার অন্ধকার?
দম ফেটে যায় কার ও ঘরে
ধোঁয়ায় লালে ঘোর



এখন দশটা রাত:
ট্রাম চলে না নোনাপুকুরে
কবর ঘরে সাদায়
কালো বোমারু হাত।

আলো ঘুরে যায়, যায় পিছনে
দাঁতে বালির কুচি:
লালমোহন সেন—
তিনি এলেন, ফিরে এলেন?
আলী ইমাম, কেয়া, আশীষ···
—তিনি কী এসেছেন—?
নিচে কেবল ঢেউয়ের হাঁক
বাঘের ডাক, হাঙর, সাঁপ
কুমীরে কিলবিল—
আমি চিনতে পারছি না কে
সিরাজ, সুবোধ, একটা দেশের
বুক বরাবর খিল।

বুড়ো মিঞার নায় চলেছি
লোনা পানির গাঙে
রমজানের চাঁদ
ভাবতেই পারছি না, কাদের
ভাঙা ভিটেয় এসে
পোছে না সংবাদ—
তারা শিকার রক্তে দুঃখে
ভয়ে ও বেদনায়
আমি তাদেরই ভাই:
একা উজান বাইতে গেলে
আদি গঙ্গায় বুড়িগঙ্গায়
একা গোলুয়ে একা গোলুয়ে
কপালই চাপড়াই॥

অসিতকুমার ভট্টাচার্য

## পিতার প্রতি

পিতার প্রতি রুদ্ধ রোষে অনির্বাণ জ্বলি !
এখানে কেন এলাম ? একি উত্তরাধিকার !
রাত্রি শুধু দীর্ঘদাহ, দিবস অঙ্গার।
নখরে ছিঁড়ি নিজের-ই শিরা, দু-পায়ে শুধু দলি—
স্বপ্ন সাধ নগ্ন ফুল, আনত শ্বেত কলি,
সাপের মতো শরীর কোটে আঁধারে বারবার।

আকাশ ঘন মৃত্যু-নীল। সাগর নীল ঘৃণা।
মৃত্যুকাম তরঙ্গেরা নিহত তটে তটে
বজ্র দাও। বজ্র দাও। ঊর্দ্ধবাহু বটে—
সামনে কোনো সরণি নেই আত্মঘাত বিনা !
এখন কোনো উপায় নেই আত্মপাত বিনা ?
গঙ্গাধারা লুপ্তবেগ সময়ে রূঢ় জটে।
মানুষ বলে আমাকে কেউ কখনও চিনবি না !
পিতার প্রতি রুদ্ধ রোষে কালের কালো পটে—
দহ্যমান নগ্ন দেহ। আমি তো একাকী না—
ভস্মসার অস্থি শিরা, ছড়ায় তটে তটে—
ছড়ায় হাওয়া ছড়ায় আর আমি তো একাকী না।

তারাপদ রায়

## কল্লোলিনীর সমাধিস্তম্ভের জন্য

কেমন লাগছে, দুপুর বেলার খিদিরপুরে
ঘুরে ঘুরে ?
হঠাৎ দাঙ্গা কলকাতায়
হঠাৎ বাড়ি ফেরার তাগাদায়
তিরিশ লক্ষ ভীত-পাগল আবাল-বৃদ্ধ যুবা।

'দিলরুবা এ দিলরুবা'…
এই তো কাল সকাল বেলায়
গ্রামোফোনের রেকর্ড ঘোরে চাচার রেঁস্তরায়।
কখন দাঙ্গা, কিসের দাঙ্গা কলকাতায় ?

কলকাতার মুখে আগুন
দুপুর বেলার বোকা শহর কখন হল খুন।

কল্লোলিনী তিলোত্তমার পায়ের নিচে মড়া ;
দুপুর বেলার আলোয় ভরা
ছায়ায় ভরা খিদিরপুরে,
ঘুরে ঘুরে
ডকের নোনা জল।
কল্লোলিনী, তোমার জন্যে অশ্রু সম্বল।

গোলাম কুদ্দুস

# একজন শ্রমিক ও সাহিত্য

চাষীর ছেলের কে নাম রেখেছিল গওসল? এ কী স্কুলের মৌলভীর কাণ্ড! এঁরা অনেক সময় নাম পালটিয়ে চাষীর ছেলেকে ভদ্র করার চেষ্টা করেন! কিন্তু তুমি হয়ে গেলে শ্রমিক। আর গওসল শব্দটা শোনামাত্র ভদ্র চেহারার পরিবর্তে কেন জানি কাঁটা-ফোলানো সজারুর দেহ আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

যাকগে, নামের সঙ্গে তোমার চেহারার আদৌ মিল ছিল না। বরং সাহিত্যের জটিল আলোচনা উঠলে সর্বাগ্রে তোমার সরল মুখখানাই আমার মনে পড়ে।

সাহিত্য নিয়ে বিদ্বানদের মুখে কি কম আলোচনা শুনেছি! তার মূল্য কমানোর সাহস আমার নেই। কিন্তু সে সব কথার সাড়ে ষোলো আনাই কেন মন ভুলে বসে থাকে? অথচ চৌদ্দ বছর আগে তোমার মুখে যা শুনেছিলাম তার প্রায় প্রত্যেকটা কথাই এখনো স্পষ্ট স্মরণ করতে পারি!

তখন সবেমাত্র দেশ ভাগ হয়েছে। তখনো ঢাকা রেল স্টেশনের অদূরে মালগাড়ীর শত শত ওয়াগনে ভারতত্যাগী হাজার হাজার রেলশ্রমিককে বাস করতে হত। তুমি হয়তো লক্ষ্য করে থাকবে সেই নরকবাসের চিত্র আমার একটি উপন্যাসে স্থানলাভও করেছে। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে তুমি আর আমি ঐ রকম একখানা ওয়াগনে একসঙ্গে বেশ কিছুদিন বাস করেছিলাম।

তুমি হয়তো ভুলে যাওনি, ১৯৪৯ সালের প্রথম দিকে ভারত ও পাকিস্তানে একই দিনে রেল ধর্মঘটের আহ্বান জানানো হয়েছিল। তাতে শ্রমিকেরা বিন্দুমাত্র সাড়া দেয় নি। তারপরই বন্ধুদের তাড়নায় আমাকে কোলকাতা ছেড়ে কিছুদিনের জন্য ঢাকায় যেতে হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল মহৎ—রেল শ্রমিকদের প্রকৃত অবস্থা অনুসন্ধান। ব্যাপারটা এখন হাস্যকর ঠেকে। কিন্তু কোনো জিনিসই যে তুচ্ছ নয় তার কারণ বোধ হয় এই যে, মানুষের কাছে গেলে কিছু না কিছু সব সময়েই শেখা যায়।



আমাকে আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছিল, আর তুমি হয়েছিলে কার্যত আমার বডিগার্ড! আমার আত্মার দিকেও যে তুমি হাত বাড়িয়েছিলে তখন তা কি জানতাম!

রাত্রিবেলা গা ঢাকা দিয়ে চলাফেরা করা যেত, দিনের বেলাটাই ছিল মারাত্মক। ওয়াগনের ঘেরাটোপের মধ্যে এমনিতেই নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসত। তার উপর যখন চারদিকে ডজন ডজন কয়লার উনুন জ্বালানো হত আর তার ধোঁয়া মলমূত্রের দুর্গন্ধের সঙ্গে মিলে নাকে এসে ঢুকত, তখন কল্পিত অন্ধকূপ হত্যার কাহিনী নিতান্ত সত্য বলেই বোধ হত। কেউ কি ভ্রমেও কল্পনা করতে পেরেছিল এটাই হবে তোমার আমার মধ্যে সাহিত্য আলোচনার উপযুক্ত পরিবেশ!

আমি কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তুমি কি করে কমিউনিস্ট হলে?

শরৎচন্দ্রের বই পড়ে!

বল কি!

হাঁ, সত্যি বলছি।

কিন্তু তাঁর বইয়ের মধ্যে কমিউনিজম কোথায়।

তা জানি নে। তবে এটা জানি তাঁর বই না পড়লে আমি কমিউনিস্ট হতে পারতাম না।

ব্যাপারটা খোলসা করে বলো দেখি! এখানকার এই ধোঁয়ার চেয়েও যে ধোঁয়াটে লাগছে।

তা কি করব বলুন!

কিছু করতে বলছি নে, একটু বুঝিয়ে বলতে বলছি।

তুমি তখন ঢোক গিলে বললে, আমি যা বলেছি তার চেয়ে বেশি বলতে পারব না।

ক্ষণিকের তরে তোমার মুখটা যে একটা অজ্ঞাত কারণে লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছিল, তা আমার দৃষ্টি এড়ায় নি। তাই পীড়াপীড়ি করতে ইচ্ছে হল না।

আচ্ছা বলতে হবে না।

রাগ করছেন?

রাগ করব কেন! কাউকে দিয়ে তো তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু বলানো যায় না।

আপনি কি মনে করছেন এর মধ্যে কোনো গোপন কথা আছে ?

কি করে জানব !

শুনতেই হবে ?

বললেই শুনব। তবে এ এমন একটা ব্যাপার নয় যা না শুনলেই নয়। বললেই বা তোমার কি ক্ষতি হবে, আর শুনলেই বা আমার কি লাভ হবে জানিনে। তবে কৌতূহল হয়েছিল এই যা।

তুমি একটু চুপ করে থেকে বললে, আচ্ছা বলছি। বাড়ি আমার ময়মনসিং জেলার গ্রামে। আমরা খুব গরীব ছিলাম। তবু বাপ আমাকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিল। আমি যখন ভাগের অঙ্ক কষছি তখন বাপ মারা গেল। আমার দ্বারা কি চাষের কাজ হয়! কর্তারা ভাগের জমি ছাড়িয়ে নিল। গরু-জোড়া বিক্রি করে দিলাম। সংসারে তখন আমার নিজের বলতে থাকল সাড়ে তিন বিঘে জমি আর এক মা। তাছাড়া আরো একজন ছিল, তার কথা মনে হলে এখনো আমার চোখে পানি আসে।

সেও চাষীর মেয়ে। আমার চোখে ছিল পরী। পরী বলেই তাকে ডাকতাম। কি করে তার সঙ্গে আমার—সে অনেক কথা, সে সব থাক। পরীর বাপ চাষী হলেও তার ছিল চারখানা লাঙল, চারজোড়া গরু, তিনটে দুধেল গাই, পাঁচটা জোয়ান মর্দ ছেলে। আমার সঙ্গে তার মেয়ের বিয়ে দেবে কেন ?

একদিন পরীকে বললাম, যদি চাকরী পাই তো দেশে ফিরব, নইলে এই শেষ দেখা।

সে খুব কাঁদতে লাগল।

আমি ময়মনসিং শহরে এলাম। ছয় মাস এ হেন কাজ নেই যা আমি করিনি। সে সব কথাও থাক। ঘুরতে ঘুরতে শেষে আমার কপাল খুলে গেল—রেলে সামান্য একটা চাকরী পেলাম। তাতেই আমি যেন হাতে স্বর্গ পেলাম, মসজিদে গিয়ে সিন্নি দিলাম। হাসছেন কী, আমি তখন যে খুব ধার্মিক ছিলাম! যাক, শুনুন, ছ'মাস পরে আমি তো আশায় আনন্দে আটখানা হয়ে বাড়ি গেলাম, গিয়েই কি শুনলাম জানেন? পরীর বিয়ে হয়ে গেছে!

আমার মাথা খারাপ হয়ে গেল। যে গ্রামে তার শ্বশুরবাড়ি, সেখানে গেলাম। তারা কুটুম ভেবে আদরযত্ন করে খাওয়াল। পরীর সাথে রাত্রে



লুকিয়ে দেখা করলাম। সে কেঁদে বুক ভাসিয়ে দিল, কিন্তু আমার সঙ্গে পালাতে রাজী হল না। পরদিন আবার রাত্রে দেখা করলাম। সে আমাকে বিয়ে করতে অনুরোধ করল। বিয়ে করলেই আমার সব কষ্ট চলে যাবে।

মন সায় দিল না। তিন মাস পরে আবার পরীর শ্বশুরবাড়ি গেলাম। আবার অনিচ্ছুক পরীর সঙ্গে দেখা করলাম। ওরা নিশ্চয়ই সন্দেহ করেছিল, আমাদের দুইজনকে ওরা হাতেনাতে ধরে ফেলল। পরীর দশা কি হল জানিনে, আমাকে ওরা মেরে মেরে আধমরা করে ছেড়ে দিল।

আমি মাস তিনেক পরে পরীর কথাই রাখলাম—বিয়ে করলাম। কিন্তু তাকে ভুলতে পারলাম কই ?

আমাকে লোকে বলতে লাগল ক্ষ্যাপা, আধপাগলা। আমি প্রায়ই অন্যমনস্ক থাকতাম। কয়েকবার গাড়ী চাপা পড়তে পড়তে পড়িনি।

ঢাকা ওয়ার্কসপে বদলী হয়ে এলাম। কারও সঙ্গে কথা বলতে গল্প করতে ভালো লাগত না, একা একা ঘুরে বেড়াতাম, আর মাঝে মাঝে সিনেমা দেখতাম। বাড়ি গেলে বৌ বলত, বাসা কর। আমি সে-কথা এড়িয়ে যেতাম।

একবার বৌকে শ্বশুরবাড়ি থেকে আনতে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখলাম তার খুব অসুখ। সে গ্রামের ডাক্তারকে আমি চিনতাম, কারণ তিনি আমাদের গ্রামের জামাই। তাঁর কাছে আমি ওষুধ আনতে এবং গল্প করতে যেতাম। একদিন দেখি তাঁর টেবিলের উপর 'পল্লীসমাজ' বলে একটা বই পড়ে আছে। ডাক্তার কলে বেরিয়েছিলেন, আমি বইখানা একটু একটু করে পড়তে লাগলাম। কয়েকপাতা পড়েই যেন ওর মধ্যে ডুবে গেলাম। ডাক্তার এলে বললাম, এটা একটু নিয়ে যাব ?

একে আমি ওঁদের গ্রামের জামাই, তার উপর শহরে চাকরি করি, ওরা একটু খাতির করত। ডাক্তার হেসে বললেন, যাওয়ার আগে ফেরত দিয়ে যাবেন কিন্তু।

আমার কোনোকালে বইপড়া অভ্যেস ছিল না। তাই প্রথমে পড়াটা আয়ত্ত করতে বেশ বেগ পেতে হল। কিন্তু বইটা যেন আমার হাতে আঠার মতো লেগে রইল। আমি কিছুতেই ছাড়তে পারি না। পড়ি আর ভাবি। আগে চোখ বুজলেই পরীর মুখ দেখতে পেতাম। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেলাম যখন এক-একবার রমা এবং রমেশের মুখও চোখের পাশে এসে

উঁকি মারতে লাগল। আমি যেন ওদের হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারি। ওরা আমার কাছে এমন স্পষ্ট, এমন জ্যান্ত! আমি তাজ্জব হয়ে গেলাম! এ কেমন করে হয়!

আমি ওদের ভালোবেসে ফেললাম। হঠাৎ আমার মনে হল কি জানেন? রমা এবং রমেশের দুঃখ আমার চেয়ে কম নয়! এ যেন পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য! কেননা আমার কেবলি মনে হত, আমার মতো দুঃখী দ্বিতীয় কেউ নেই। আমার মতো হতভাগ্য তাহলে সংসারে আরো আছে! আমি যেন ঘুমের ঘোর থেকে জেগে উঠলাম।

তখন চারপাশের লোকজনের দিকে আমার দৃষ্টি পড়ল। এক-একজনকে দেখতাম আর ভাবতাম, এর কি দুঃখ? ক্রমেই আমি তাদের মধ্যে দুঃখের সন্ধান পেতে লাগলাম। তারপর আমার মনে হল, আমার চারপাশে এত দুঃখী লোক! অথচ আমি এদের মধ্যেই এতদিন বাস করে আসছি! তবু তাদের দেখি নি! এ কি করে হয়! আমার সে সময়কার বিচিত্র বিস্ময়ের কথা আপনাকে কি করে বোঝাব! পরীর জন্য তখনো আমার চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল, কিন্তু বুকের অসহ্য ভার যেন একটু নেমে গেল।

তখন জানাশোনা কত লোকের সুখ-দুঃখের কথাই যে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করে ভাবতে শিখলাম তা বলতে গেলে সাত দিন সাত রাত লেগে যাবে। আমি তখন খুঁজে খুঁজে এক লাইব্রেরী বের করলাম। সেখান থেকে শরৎচন্দ্রের বই এনে এনে পড়তে লাগলাম। যতই পড়ি ততই দেখি দুঃখ এক রকমের নয়, বহু রকমের! দুঃখের যে এত রকমফের আছে তাই কি জানতাম! আবার সুখও যে হরেক রকমের তাও তো চোখে পড়ে নি! ক্রমেই আমার চারদিকে বইয়ের লোকেরা এসে ঘিরে দাঁড়াতে লাগল। আমি তাদের সঙ্গে মনে মনে কত কথাই বলতে লাগলাম!

এমন সময় কমিনিউস্টদের সঙ্গে আলাপ হল। তারাও আমাকে মানুষের দুঃখের কথা বলল, শোষণ এবং সংগ্রামের কথা শোনাল, মুক্তির উপায় জানাল। সব কি আর বুঝেছি, না তারাই বোঝাতে পেরেছে? তবু আমার মন বলল—বুঝেছি! দেশদেশান্তরের কত মানুষ যেন আমার কাছে এসে তাদের সুখ-দুঃখের কথা বলতে লাগল। তাদের আমি দেখি নি কিন্তু কল্পনায় তাদের ভাই-বন্ধু বলে স্বীকার করে নিতে কষ্ট হল না। এক বিরাট দুনিয়া আমার চোখের সামনে খুলে গেল!



গওসল, তুমি তোমার কথা শেষ করে জিজ্ঞাসু নেত্রে আমার দিকে চেয়ে রইলে। ভাবখানা এই: আমার জিজ্ঞাসার জবাব মিলেছে কিনা। তোমার সহজ সুন্দর কাহিনীটি আমাকে বেশ নাড়া দিয়েছিল, তাই আর কিছু খুঁটিয়ে জানার প্রয়োজন অনুভব করি নি। নিজের মনেই তোমার জীবনের অকথিত ফাঁকগুলি পূর্ণ করে তোমাকে বুঝতে চেষ্টা করছিলাম। আর ভাবছিলাম বহু বিতর্কিত সমাজ-ব্যক্তি-রাজনীতি-সাহিত্যের সম্পর্কের সমস্যা।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে তুমি বললে, আর একটা কথা আপনাকে বলা হয় নি। মানুষ সম্পর্কে আমার পর্যবেক্ষণশক্তি যেটুকু বেড়ে গেল তাতেই আমি আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলাম, শতকরা নিরানব্বই ভাগ লোক শুধু নিজের কথাই চিন্তা করে, আর নিজের দুঃখকেই সবচেয়ে বড় মনে করে! জানেন এতেই সবকিছু গণ্ডগোলের সৃষ্টি! আপনার কি মত?

আমি শুনছি।

আচ্ছা যাদের চিনি না জানি না সাহিত্য আমার কাছে কী করে তাদের টেনে আনে? কাছে মানে? যাকে বলে একেবারে বুকের মধ্যে! আর তাতেই বুকটা বড় হয়ে ওঠে। অনেক মানুষকে ভালোবেসে ফেলি! আর কেবলি মনে হয় তাদের দুঃখের কারণ কি দূর করা যায় না? আপনার সে রকম মনে হয় না?

আমি শুনছি।

তুমি বললে, আর একটা কথা, সাহিত্য পড়লে কেন ভয় কমে যায়? সাহিত্যের মানুষের কথা যতই ভাবি ততই যেন সাহস পাই। তার কারণ কি এই তারা অনেকে একসঙ্গে বুকের ভিতর বসে থেকে সাহস দেয়? আপনার কি ধারণা?

আমি শুনছি।

তুমি রাগের ভান করে বললে, ভালো হবে না কিন্তু। আপনি কোনো কথার জবাব দিচ্ছেন না। আর দেখুন, আমার মনে হয় ধনীরা মানুষকে ভাগ করে করে রেখেছে, সাহিত্যের মধ্যে তারা বেশ পাশাপাশি এসে দাঁড়ায়। আপনি কি বলেন?

আমি শুনছি।

তুমি তখন বললে, আপনি ভারি খারাপ লোক।

সমরেশ বসু

# আদাব

রাত্রির নিস্তব্ধতাকে কাঁপিয়ে দিয়ে মিলিটারি টহলদার গাড়িটা একবার ভিক্টোরিয়া পার্কের পাশ দিয়ে একটা পাক খেয়ে গেল।

শহরে একশো চুয়াল্লিশ ধারা আর কারফিউ অর্ডার জারী হয়েছে। দাঙ্গা বেধেছে হিন্দু আর মুসলমানে। মুখোমুখি লড়াই—দা, শড়কি, ছুরি, লাঠি নিয়ে। তাছাড়া চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে গুপ্ত-ঘাতকের দল—চোরাগোপ্তা হানছে অন্ধকারকে আশ্রয় করে।

লুঠেরা-রা বেরিয়েছে তাদের অভিযানে। মৃত্যু-বিভীষিকার এ-অন্ধকার রাত্রি তাদের উল্লাসকে তীব্রতর করে তুলেছে। বস্তিতে বস্তিতে জ্বলছে আগুন, মৃত্যু-কাতর নারী-শিশুর চিৎকার স্থানে স্থানে আবহাওয়াকে বীভৎস করে তুলছে। তার ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে সৈন্যবাহী গাড়ি। তারা গুলি ছুঁড়ছে দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে—আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে।

দুদিক থেকে দুটো গলি এসে মিশেছে এ জায়গায়। ডাস্টবিনটা উলটে এসে পড়েছে গলি দুটোর মাঝখানে খানিকটা ভাঙা-চোরা অবস্থায়। সেটাকে আড়াল করে গলির ভিতর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল একটি লোক। মাথা তুলতে সাহস হল না, নির্জীবের মতো পড়ে রইল খানিকক্ষণ। কান পেতে রইল দূরের অপরিস্ফুট কলরবের দিকে। কিছুই বোঝা যায় না—'আল্লা-হু-আকবর' কি 'বন্দেমাতরম্।'

হঠাৎ ডাস্টবিনটা নড়ে উঠল। আচম্বিতে শিরশিরিয়ে উঠল দেহের সমস্ত শিরা-উপশিরা। দাঁতে দাঁত চেপে হাত-পাগুলোকে কঠিন করে লোকটা প্রতীক্ষা করে রইল একটা ভীষণ কিছুর জন্য। কয়েকটা মুহূর্ত কাটে।··· নিশ্চল, নিস্তব্ধ চারিদিক।

বোধ হয় কুকুর। তাড়া দেওয়ার জন্য লোকটা ডাস্টবিনটাকে ঠেলে দিল



একটু। খানিকক্ষণ চুপচাপ! আবার নড়ে উঠল ডাস্টবিনটা। ভয়ের সঙ্গে এবার একটু কৌতূহল হল। আস্তে আস্তে মাথা তুলল লোকটা।···ওপাশ থেকেও উঠে এল ঠিক তেমনি একটা মাথা! মানুষ! ডাস্টবিনের দুই পাশে দুটি প্রাণী, নিস্পন্দ, নিশ্চল। হৃদয়ের স্পন্দন তালহারা—ধীর···। স্থির চারটে চোখের দৃষ্টি ভয়ে সন্দেহে উত্তেজনায় তীব্র হয়ে উঠেছে। কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। উভয়ে উভয়কে ভাবছে খুনী। চোখে চোখ রেখে উভয়েই একটা আক্রমণের প্রতীক্ষা করতে থাকে কিন্তু খানিকক্ষণ অপেক্ষা করেও কোনো পক্ষ থেকেই আক্রমণ এল না। এবার দুজনের মনেই একটা প্রশ্ন জাগল—হিন্দু না মুসলমান? এ প্রশ্নের উত্তর পেলেই হয়তো মারাত্মক পরিণতিটা দেখা দেবে। তাই সাহস করছে না কেউ কাউকে সে-কথা জিজ্ঞেস করতে। প্রাণভীত দুটি প্রাণী পালাতেও পারছে না—ছুরি হাতে আততায়ীর ঝাঁপিয়ে পড়ার ভয়ে।

অনেকক্ষণ এই সন্দিহান ও অস্বস্তিকর অবস্থায় দুজনেই অধৈর্য হয়ে পড়ে। একজন শেষ অবধি জিজ্ঞেস করে ফেলে,—হিন্দু না মুসলমান?

—আগে তুমি কও, অপর লোকটি জবাব দেয়।

পরিচয়কে অস্বীকার করতে উভয়েই নারাজ। সন্দেহের দোলায় তাদের মন দুলছে। প্রথম প্রশ্নটা চাপা পড়ে, আবার অন্য কথা আসে। একজন জিজ্ঞেস করে বাড়ি কোন্‌খানে?

—বুড়িগঙ্গার হেই পারে—সুবইডায়। তোমার?

—চাষারা—নারায়ণগঞ্জের কাছে।···কি কাম কর?

—নাও আছে আমার, না'য়ের মাঝি।—তুমি?

—নারায়ণগঞ্জের সূতাকলে কাম করি।

আবার চুপচাপ। অলক্ষ্যে অন্ধকারের মধ্যে দুজনে দুজনের চেহারাটা দেখবার চেষ্টা করে। চেষ্টা করে উভয়ের পোশাক-পরিচ্ছদটাকে খুঁটিয়ে দেখতে। অন্ধকার আর ডাস্টবিনটার আড়াল সেদিক থেকে অসুবিধা ঘটিয়েছে। হঠাৎ কাছাকাছি কোথায় একটা সোরগোল ওঠে। শোনা যায় দু-পক্ষেরই উন্মত্ত কণ্ঠের ধ্বনি। সূতাকলের মজুর আর নাওয়ের মাঝি দুজনেই সন্ত্রস্ত হয়ে একটু নড়েচড়ে ওঠে।

—ধারে কাছেই ঘ্যান্ লাগছে, সূতা-মজুরের কণ্ঠে আতঙ্ক ফুটে উঠল।

—হ, চল এইখান থেইক্যা উইঠা যাই, মাঝিও বলে অনুরূপ কণ্ঠে।

সূতা-মজুর বাধা দিল: আরে না না—উইঠো না। জানটারে দিবা নাকি?

মাঝির মন আরো সন্দেহে দুলে উঠল। লোকটার কোনো বদ্-অভিপ্রায় নেই তো! সূতা-মজুরের চোখের দিকে তাকাল সে। সূতা-মজুরও তাকিয়েছিল, চোখে চোখ পড়তেই বলল—বইয়ো। যেমন বইয়া রইছ—সেই রকমই থাক।

মাঝির মনটা ছাঁৎ করে উঠল সূতা-মজুরের কথায়। লোকটা কি তা হলে তাকে যেতে দেবে না নাকি। তার সারা চোখে সন্দেহ আবার ঘনিয়ে এল। জিজ্ঞেস করল—ক্যান্?

—ক্যান্? সূতা-মজুরের চাপা গলায় বেজে উটল—ক্যান্ কি, মরতে যাইবা নাকি তুমি?

কথা বলার ভঙ্গিটা মাঝির ভালো ঠেকল না। সম্ভব-অসম্ভব নানারকম ভেবে সে মনে মনে দৃঢ় হয়ে উঠল।—যামু না তো কি এই আন্দাইরা গলির ভিতরে পইড়া থাকুম নাকি?

লোকটার জেদ দেখে সূতা-মজুরের গলায়ও ফুটে উঠল সন্দেহ! বলল—তোমার মতলবটা তো ভালো মনে হইতাছে না। কোন জাতির লোক তুমি কইলা না, শেষে তোমাগো দলবল যদি ডাইকা লইয়া আহ আমাকে মারনের লেইগা?

—এইটা কেমুন কথা কও তুমি?—স্থান-কাল ভুলে রাগে দুঃখে মাঝি প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে।

—ভালো কথাই কইছি ভাই; বইয়ো, মানুষের মন বোঝ না?

সূতা-মজুরের গলায় যেন কি ছিল, মাঝি একটু আশ্বস্ত হল শুনে।

—তুমি চইলা গেলে আমি একলা থাকুম নাকি?

সোরগোলটা মিলিয়ে গেল দূরে। আবার মৃত্যুর মতো নিস্তব্ধ হয়ে আসে সব—মুহূর্তগুলিও কাটে যেন মৃত্যুর প্রতীক্ষার মতো। অন্ধকার গলির মধ্যে ডাস্টবিনের দুই পাশে দুটি প্রাণী ভাবে নিজেদের বিপদের কথা, ঘরের কথা, মা-বউ ছেলেমেয়েদের কথা···তাদের কাছে কি আর তারা প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারবে—না তারাই থাকবে বেঁচে!···কথা নেই, বার্তা নেই, হঠাৎ কোত্থেকে বজ্রপাতের মতো নেমে এল দাঙ্গা। এই হাটে-বাজারে-দোকানে এত



হাসাহাসি, কথা-কওয়াকয়ি—আবার মুহূর্ত পরেই মারামারি, কাটাকাটি—একেবারে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিল সব। এমনভাবে মানুষ নির্মম নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে কি করে? কি অভিশপ্ত জাত!···সূতা-মজুর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। দেখাদেখি মাঝিরও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে।

—বিড়ি খাইবা? সূতা-মজুর পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে বাড়িয়ে দিল মাঝির দিকে। মাঝি বিড়িটা নিয়ে অভ্যাসমতো দু-একবার টিপে, কানের কাছে বার কয়েক ঘুরিয়ে চেপে ধরল ঠোঁটের ফাঁকে। সূতা-মজুর তখন দেশলাই জ্বালাবার চেষ্টা করছে। আগে লক্ষ্য করেনি জামাটা কখন ভিজে গেছে। দেশলাইটাও গেছে সেঁতিয়ে। বার কয়েক খস্ খস্ শব্দের মধ্যে শুধু এক-আধটা নীলচে ঝিলিক দিয়ে উঠল। বারুদ-ঝরা কাঠিটা ফেলে দিল বিরক্ত হয়ে।

হালার ম্যাচ্‌বাতিও গেছে সেঁতাইয়া।—আর একটা কাঠি বের করল সে।

মাঝি যেন খানিকটা অসবুর হয়েই উঠে এল সূতা-মজুরের পাশে।

—আরে জ্বলব জ্বলব, দেও দেহিনি—আমার কাছে দেও। সূতা-মজুরের হাত থেকে দেশলাইটা সে প্রায় ছিনিয়েই নিল। দু-একবার খস্ খস্ করে সত্যিই সে জ্বালিয়ে ফেলল একটা কাঠি।

—সোহান্ আল্লা!—নেও নেও—ধরাও তাড়াতাড়ি।···

ভূত দেখার মতো চমকে উঠল সূতা-মজুর। টেপা ঠোঁটের ফাঁক থেকে পড়ে গেল বিড়িটা।

—তুমি···?

একটা হালকা বাতাস এসে যেন ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিল কাঠিটা। অন্ধকারের মধ্যে দুজোড়া চোখ অবিশ্বাসে উত্তেজনায় আবার বড় বড় হয়ে উঠল। কয়েকটা নিস্তব্ধ পল কাটে।

মাঝি চট্ করে উঠে দাঁড়াল। বলল—হ আমি মোছলমান। কি হইছে?

সূতা-মজুর ভয়ে ভয়ে জবাব দিল—কিছু হয় নাই, কিন্তু···

মাঝির বগলের পুঁটলিটা দেখিয়ে বলল, ওইটার মধ্যে কি আছে?

—পোলা-মাইয়ার লেইগা দুইটা জামা আর একখানা শাড়ি। কাইল আমাগো ঈদের পরব জান?

—আর কিছু নাই তো ?—সূতা-মজুরের অবিশ্বাস দূর হতে চায় না।

—মিথ্যা কথা কইতেছি নাকি ? বিশ্বাস না হয় দেখ।—পুঁটলিটা বাড়িয়ে দিল সে সূতা-মজুরের দিকে।

—আরে না না, ভাই, দেখুম আর কি। তবে দিনকালটা দেখছ তো বিশ্বাস করন যায়—তুমিই কও ?

—হেই তো হক্ কথাই। দেইহ ভাই—তুমি কিছু রাখ-টাক নাইতো ?

—ভগবানের কিরা কইরা কইতে পারি একটা সুইও নাই। পরাণটা লইয়া অখন ঘরের পোলা ঘরে ফিরা যাইতে পারলে হয়।—সূতা-মজুর তার জামা-কাপড় নেড়েচেড়ে দেখায়।

আবার দুজনে বসল পাশাপাশি। বিড়ি ধরিয়ে নীরবে বেশ মনযোগ-সহকারে দুজনে ধুমপান করল খানিকক্ষণ।

—আইচ্ছা···। মাঝি এমনভাবে কথা বলে যেন সে তার কোনো আত্মীয়-বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছে।

—আইচ্ছা—আমারে কইতে পার নি—এই মাইর-দইর, কাটাকুটি কিসের লেইগা ?

সূতা-মজুর খবরের কাগজের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে, খবরাখবর সে জানে কিছু। বেশ একটু উষ্ণ কণ্ঠেই জবাব দিল সে—দোষ তো তোমাগো ওই লীগওয়ালাগোই। তারাই তো লাগাইছে হেই কিয়ের সংগ্রামের নাম কইরা।

মাঝি একটা কটূক্তি করে উঠল, হেই সব আমি বুঝি না। আমি জিগাই মারামারি কইরা হইব কি। তোমাগো দু-গা লোক মরব আমাগো দু-গা মরব। তাতে দ্যাশের কি উপকারটা হইব ?

—আরে আমিও তো হেই কথাই কই। হইব আর কি, হইব আমার এই কলাটা।—হাতের বুড়ো আঙুল দেখায় সে : তুমি মরবা, আমি মরুম, আর আমাগো পোলামাইয়াগুলি ভিক্ষা কইরা বেড়াইব। এই গেল সনের রায়টে আমার ভগ্নিপতিরে কাইটা চাইর টুকরা কইর মারল। ফলে হইল বিধবা বইন আর তার পোলামাইয়ারা আইয়া পড়ল আমার ঘাড়ের উপুর। কই কি আর সাধে, হ্যাতারা হেই সাততলার উপুর পায়ের উপর পা দিয়া হুকুম জারী কইরা বইয়া রইল আর হালার মরতে মরলাম আমরাই।



—মানুষ না, আমরা য্যান্ কুত্তার বাচ্চা হইয়া গেছি ; নাইলে এমুন কামড়াকামড়িটা লাগে কেম্‌বায় ?—নিষ্ফল ক্রোধে মাঝি দু-হাত দিয়ে হাঁটু দুটোকে জড়িয়ে ধরে।

—আমাগো কথা ভাবে কেডা ? এই যে দাঙ্গা বাধল—অখন দানা জুটাইব কোন্ সুমন্দি। নাওটারে কি আর ফিরা পামু ? বাদামতলির ঘাটে কোন্ অতলে ডুবাইয়া দিছে তারে—তার ঠিক কি। জমিদার রূপবাবুর বাড়ির নায়েবমশায় পি:ত্যাক মাসে একবার কইরা আমার নায়ে যাইত নইরার চরে কাছারি করতে। বাবুর হাত য্যান্ হজরতের হাত, বখ্‌শিস্ দিত পাঁচ, নায়ের কেরায়া দিত পাঁচ, একুনে দশটা টাকা। ভাই, আমার মাসের খোরাকি জুটাইত হেই বাবু। আর কি হিন্দুবাবু আইব আমার নায়ে।

সূতা-মজুর কি বলতে গিয়ে থেমে গেল। এক সঙ্গে অনেকগুলি ভারি বুটের শব্দ শোনা যায়। শব্দটা যেন বড় রাস্তা থেকে গলির অন্দরের দিকেই এগিয়ে আসছে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। শঙ্কিত জিজ্ঞাসা নিয়ে উভয়ে চোখাচোখি করে।

—কি করবা ? মাঝি তাড়াতাড়ি পুঁটলিটাকে বগলদাবা করে।

—চল পলাই। কিন্তুক যামু কোন্‌দিকে ? শহরের রাস্তাঘাট তো ভালো চিনি না।

মাঝি বলল, চল যেদিকে হউক। মিছামিছি পুলিশের মাইর খামু না—ওই ঢ্যামনাগো বিশ্বাস নাই।

—হ। ঠিক কথাই কইছ। কোন্‌দিকে যাইবা কও—আইয়া তো পড়ল।

—এই দিকে—

গলিটার যে মুখটা দক্ষিণ দিকে চলে গেছে সেদিকে পথনির্দেশ করে মাঝি। বলল, চল, কোনো গতিকে একবার যদি বাদামতলি ঘাটে গিয়া উঠতে পারি—তাইলে আর ভয় নাই।

মাথা নিচু করে মোড়টা পেরিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে তারা ছুটল, সোজা এসে উঠল একেবারে পটুয়াটুলি রোডে। নিস্তব্ধ রাস্তা ইলেকট্রিকের আলোয় ফুটফুট করছে। দুজনেই একবার থমকে দাঁড়াল—ঘাপটি মেরে নেই তো কেউ ? কিন্তু দেরি করারও উপায় নেই। রাস্তার এ-মোড় ও-মোড় একবার দেখে নিয়ে ছুটল সোজা পশ্চিম দিকে। খানিকটা এগিয়েছে এমন সময় তাদের পিছনে

শব্দ উঠল ঘোড়ার খুরের। তাকিয়ে দেখল—অনেকটা দূরে এক অশ্বারোহী এদিকেই আসছে। ভাববার সময় নেই। বাঁ পাশে মেথর যাতায়াতের একটা সরু গলির মধ্যে আত্মগোপন করল তারা। একটু পরেই ইংরেজ অশ্বারোহী রিভলবার হাতে তীব্র বেগে বেরিয়ে গেল তাদের বুকের মধ্যে অশ্ব-খুরধ্বনি তুলে দিয়ে। শব্দ যখন চলে গেল অনেক দূরে, উঁকিঝুঁকি মারতে মারতে আবার তারা বেরোয়।

—কিনারে কিনারে চল। সুতা-মজুর বলে।

রাস্তার ধার ঘেঁষে সন্ত্রস্ত দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলে তারা।

—থাড়াও। মাঝি চাপা-গলায় বলে। সুতা-মজুর চমকে থমকে দাঁড়ায়।

—কি হইল ?

—এদিকে আইয়ো—সুতা-মজুরের হাত ধরে মাঝি তাকে একটা পান-বিড়ির দোকানের আড়ালে নিয়ে গেল।

—হেদিকে দেখ।

মাঝির সঙ্কেত মতো সামনের দিকে তাকিয়ে সুতা-মজুর দেখল প্রায় একশো গজ দূরে একটা ঘরে আলো জ্বলছে। ঘরের সংলগ্ন উঁচু বারান্দায় দশ বারোজন বন্দুকধারী পুলিশ স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে আছে, আর তাদের সামনে ইংরেজ অফিসার কি যেন বলছে অনর্গল পাইপের ধোঁয়ার মধ্যে হাত-মুখ নেড়ে। বারান্দার নিচে ঘোড়ার জিন্ ধরে দাঁড়িয়ে আছে আর একটি পুলিশ। অশান্ত চঞ্চল ঘোড়া কেবলি পা ঠুকছে মাটিতে।

মাঝি বলে, ওইটা ইসলামপুর ফাঁড়ি। আর একটু আগাইয়া গেলে ফাঁড়ির কাছেই বাঁয়ের দিকে যে গলি গেছে সেই পথে যাইতে হইব আমাগো বাদামতলির ঘাট।

সুতা-মজুরের সমস্ত মুখ আতঙ্কে ভরে উঠল।—তবে ?

—তাই কইতেছি তুমি থাক, ঘাটে গিয়া তোমার বিশেষ কাম হইব না। মাঝি বলে, এইটা হিন্দুগো আস্তনা। আর ইসলামপুর হইল মুসলমানগো। কাইল সককালে উইঠা বাড়িত্ যাইব গা।

—আর তুমি ?

—আমি যাইগা। মাঝির গলা উদ্বেগে আর আশঙ্কায় ভেঙে পড়ে।—আমি পারুম না ভাই থাকতে। আইজ আটদিন ঘরের খবর জানি না। কি



হইল না হইল আল্লাই জানে। কোনোরকম কইরা গলিতে ঢুকতে পারলেই হইল। নৌকা না পাই সাঁতরাইয়া পার হমু বুড়িগঙ্গা।

—আরে না না মিয়া কর কি ? উৎকণ্ঠায় সুতা-মজুর মাঝির কামিজ চেপে ধরে।—কেমনে যাইবা তুমি, আঁ ?

আবেগ উত্তেজনায় মাঝির গলা কাঁপে।

—ধইরো না ভাই, ছাইড়া দেও। বোঝ না তুমি কাইল ঈদ, পোলা-মাইয়ারা সব আজ চান্দ্ দেখ্‌ছে। কত আশা কইরা রইছে তারা নতুন জামা পিন্‌ব, বাপজানের কোলে চড়ব। বিবি চোখের জলে বুক ভাসাইতেছে। পারুম না ভাই—মনটা কেমন করতাছে। মাঝির গলা ধরে আসে। সুতা-মজুরের বুকের মধ্যে টন টন করে ওঠে। কামিজ ধরা হাতটা শিথিল হয়ে আসে।

—যদি তোমারে ধইরা ফেলায় ?—ভয়ে আর অনুকম্পায় তার গলা ভরে ওঠে।

—পারব না ধরতে, ডরাইও না। এইখানে থাইকো য্যান্ উইঠো না। যাই…ভুলুম না ভাই, এই রাত্রের কথা। নসিবে থাকলে আবার তোমার লগে মোলাকাত হইব।—আদাব।

—আমিও ভুলুম না ভাই। আদাব।

মাঝি চলে গেল পা টিপে টিপে।

সুতা-মজুর বুকভরা উদ্বেগ নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বুকের ধুক্-ধুকানি তার কিছুতেই বন্ধ হতে চায় না। উৎকর্ণ হয়ে রইল সে, ভগ্‌মান—মাজি য্যান বিপদে না পড়ে।

মুহূর্তগুলি কাটে রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে। অনেকক্ষণ তো হল, মাঝি বোধহয় এতক্ষণে চলে গেছে। আহা পোলামাইয়ার কত আশা নতুন জামা পরবে, আনন্দ করে পরবে। বেচারা বাপজানের পরাণ তো। সুতা-মজুর একটা নিঃশ্বাস ফেলে। সোহাগে আর কান্নায় বিবি ভেঙে পড়বে মিয়াসাহেবের বুকে, 'হ ? মরণের মুখ থেইকা তুমি বাঁইচা আইছ ?'—সুতা-মজুরের ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফুটে উঠল, আর মাঝি—তখন কি করবে ? মাঝি তখন—

—হলট্…

ধ্বক্ করে উঠল সুতা-মজুরের বুক। বুট পায়ে কারা যেন ছুটোছুটি

করছে। কি যেন বলাবলি করছে চিৎকার করে: ডাকু ভাগ্ তা হ্যায়।

সূতা-মজুর গলা বাড়িয়ে দেখল পুলিশ-অফিসার রিভলভার হাতে রাস্তার ওপর লাফিয়ে পড়ল। সমস্ত অঞ্চলটার নৈশ নিস্তব্ধতাকে কাঁপিয়ে দুবার গর্জে উঠল অফিসারের আগ্নেয়াস্ত্র।

গুড়ুম্, গুড়ুম। দুটো নীল্‌চে আগুনের ঝিলিক। উত্তেজনায় সূতা-মজুর হাতের একটা আঙ্‌ুল কামড়ে ধরে। লাফ দিয়ে ঘোড়ায় উঠে অফিসার ছুটে গেল গলির ভিতর। ডাকুটার মরণ-আর্তনাদ সে শুনতে পেয়েছে।

সূতা-মজুরের বিহ্বল চোখে ভেসে উঠল মাঝির বুকের রক্তে তার পোলা-মাইয়ার, তার বিবির জামা-শাড়ি রাঙা হয়ে উঠেছে। মাঝি বলছে—পারলাম না ভাই। আমার ছাওয়ালেরা আর বিবি চোখের পানিতে ভাসব পরবের দিনে। দুষমনরা আমারে যাইতে দিল না তাগো কাছে।

---

শ্রীসমরেশ বসুর "আদাব" প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৫৩ সালের শারদীয় 'পরিচয়'-এ। আজকের পরিপ্রেক্ষিতে গল্পটি পুনর্মুদ্রিত হল।

হীরেন মুখোপাধ্যায়

# শিল্পী নন্দলাল

বিগত ৩রা ডিসেম্বর ১৯৬৩ নন্দলালের আশী বর্ষ পূর্তি হলে সেই উপলক্ষে তাঁর দেশবাসী তাঁকে যথোপযুক্ত সম্মান দেখান। নন্দলালের মত প্রতিভা যে কোনো দেশে যে কোনো কালেই দুর্লভ। দীর্ঘদিন একান্তে বসে এই নিরহঙ্কার আত্মপ্রচারবিমুখ শিল্পী তাঁর ভবিষ্যৎ বংশীয়দের জন্য যে বিপুল শিল্পসম্ভার সৃষ্টি করে গেছেন (এবং এখনও করছেন) তার যথার্থ মূল্য আজও নিরূপিত হয় নি। আগে তাঁর ৭০তম জন্মদিবস উপলক্ষে তাঁর শিষ্য ও গুণমুগ্ধরা মিলে তাঁর চিত্রকলার এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন এবং সেই কর্মসূচীরই অঙ্গ হিসাবে কিছুদিন পরে তাঁর চিত্রকলার একটি অ্যালবাম প্রকাশ করেন। নন্দলালের ছবির সঙ্গে যাঁদের সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুযোগ নেই তাঁদের কাছে এই অ্যালবামটি অপরিহার্য। এতে নন্দলালের জীবন ও কর্ম নিয়ে দীর্ঘ অথচ সুলিখিত একটি ভূমিকা আছে এবং তাঁর শিল্পী জীবনের বিভিন্ন পর্যায় অবলম্বনে ২৯টি বাছাই করা ছবির রঙীন ও একরঙা প্রতিলিপি আছে এবং সেই সঙ্গে আছে কিছু কার্ড স্কেচেরও প্রতিলিপি। যদিও রঙীন ছবিগুলির প্রতিলিপি সবক্ষেত্রে আশানুরূপ হয় নি এবং তাঁর অনেক শ্রেষ্ঠ ছবিই এ সংকলন থেকে বাদ পড়ে গেছে তবুও নন্দলালের চিত্রকলার একমাত্র সংকলন হিসাবে অ্যালবামটি চিত্র-প্রেমিকদের কাছে অমূল্য সম্পদ হিসাবে গণ্য হবে। দুঃখের বিষয় অ্যালবামটি এখন আর পাওয়া যায় না, এটির পুনর্মুদ্রণ দরকার। তাছাড়া নন্দলালের প্রতিভার সম্যক পরিচয় একটিমাত্র অ্যালবামে দেওয়া সম্ভব নয়, তাঁর শিল্পীজীবনের বিভিন্ন পর্ব অবলম্বনে একাধিক অ্যালবাম প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন। লক্ষ্য রাখতে হবে এই সমস্ত অ্যালবামে নন্দলালের ছবির প্রতিলিপি যাতে নিখুঁত হয় এবং সেজন্য প্রয়োজনবোধে তাঁর ছবি বাইরে পাঠিয়েও মুদ্রণ করিয়ে আনতে হবে (যেমন রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে করা হয়েছে)। এ ছাড়া দেশের শিক্ষিত জনসাধারণ যাতে নন্দলালের মূল ছবির

সঙ্গে পরিচিত হতে পারেন সেজন্য তাঁর ছবির প্রায়শই প্রদর্শনী হওয়া দরকা এবং এই সমস্ত প্রদর্শনী ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ শহরগুলি ঘুরে বেড়াবে। এই স পরিকল্পনা সফল করতে গেলে নন্দলালের ছাত্র গুণগ্রাহী এবং সরকারের মধ্যে সহযোগিতা থাকা দরকার। আশা করি তাঁর একাশীতম জন্মদিবসের পূর্বে তাঁর দেশবাসী তাঁদের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হবেন।

ইওরোপীয় রেণেসাঁর ঢেউ আমাদের দেশে পৌছেছিল ১৮শ শতকের শেষে। ১৯শ শতকে দেশে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে জোয়ার এল তারই অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ। কিন্তু সংস্কৃতির একটি শাখা অবহেলিত রইল—সেটি শিল্প। অবনীন্দ্রনাথ যখন ছবি আঁকা শুরু করেন তখন তিনিও ভারত-শিল্পের ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না। ভারত-শিল্পের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে দৈবাৎ এবং সেই থেকে তিনি আত্মনিয়োগ করলেন তাঁর নতুন শিল্প-সাধনায়। এই সাধনারই ফলস্বরূপ দেখা দিল আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলা, বিদেশীরা যার নাম দিয়েছেন নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলা।

এই নব্যবঙ্গীয় চিত্রকলার ভাগ্যে এককালে প্রশংসা ও নিন্দা দুই-ই জুটেছিল, এখন এর ভাগ্যে শুধু নিন্দাই জোটে। অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যবর্গের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে যার কয়েকটি সত্য এবং বেশির ভাগই মিথ্যা এবং রসের বিচারে অপ্রয়োজনীয়। বলা হয়েছে এই সব শিল্পীরা শুধু অতীতের দিকে তাকিয়েই ছবি এঁকেছেন, বর্তমান জগৎকে এঁরা উপেক্ষা করেছেন। এ অভিযোগ সত্য, অন্ততঃ বেশির ভাগের ক্ষেত্রে, কিন্তু তাতে কি আসে যায়? শিল্পের বিষয়বস্তু দিয়ে শিল্পকর্মের মূল্য বিচার হয় না। অতীতের দিকে তাকিয়ে ছবি আঁকলেই যদি সে ছবি অপাংক্তেয় হয়ে পড়ে তাহলে অজন্তা থেকে ইটালীয় রেণেসাঁর সব ছবিকেই ফেলে দিতে হয় আঁস্তাকুরে। জানিনা এমন প্রস্তাব কেউ করবেন কিনা। অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যবর্গের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযোগ এঁরা অতিমাত্রায় ভারতীয়ত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন এবং তার জন্য এমন কতকগুলি বিশেষ ধরণ-ধারণ প্রবর্তন করেছিলেন (যেমন—পেলব হাত পা; নুয়ে পড়া ঘাড়; ধোঁয়াটে-ধোঁয়াটে ভাব ইত্যাদি) যা চক্ষুর পক্ষে রীতিমত পীড়াদায়ক। অভিযোগের প্রসঙ্গ অংশ সম্বন্ধে বলা যেতে পারে স্বাদেশিকতা শিল্পের দোষ নয় গুণ, শিল্পের আবেদন সর্বজনীন হলেও তার ভাষা আন্তর্জাতিক নয়।



অভিযোগের দ্বিতীয় অংশ স্বীকার করে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই, অন্তত বেশির ভাগের ক্ষেত্রে কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন এর জন্য দায়ী অবনীন্দ্রনাথ নন। এঁদের সর্বশেষ অভিযোগ অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যদের রেখা অত্যন্ত দুর্বল। এঁরা ড্রইং জানতেন না। এ অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা—অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্যদের প্রত্যেকেরই ড্রইং-এ ছিল অসাধারণ দক্ষতা।

তবু এই সব শিল্পান্দোলন খুব বেশি ফলপ্রসূ হয় নি তার কারণ অবনীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ শিষ্যদের মধ্যে (কেবল নন্দলাল বাদে) প্রতিভার অভাব না থাকলেও কল্পনাশক্তির অভাব ছিল। এঁরা সবাই কিছু দূর এগিয়ে গিয়ে থেমে গেছেন তারপর একই বিষয় ও একই ভাবের পুনরাবৃত্তি সৃষ্টি করেছেন ফলে কিছুদিনের মধ্যেই এঁদের সৃষ্টির উৎস শুকিয়ে গেছে। এ ছাড়া এঁদের আবার যাঁরা শিষ্য তাঁদের অনেকেই সেরকম ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন না, ফলে অক্ষম অনুকরণের মধ্যেই এঁরা খুঁজেছেন নিজেদের সার্থকতা। এই সব অক্ষম অনুকারকদের ভীড়ে অবনীন্দ্রনাথের নিজস্ব শিল্পসৃষ্টি কিছুদিনের মধ্যেই হারিয়ে গেল। নব্য বঙ্গীয় চিত্রকলা বলতে এখনকার লোকেরা এঁদের চিত্রকলাই বোঝেন।

এই গড্ডালিকা প্রবাহ থেকে অবনীন্দ্রনাথ ছাড়া দুটি মাত্র শিল্পী বেরিয়ে এসেছিলেন—এঁরা হলেন গগনেন্দ্রনাথ ও নন্দলাল। গগনেন্দ্রনাথ যদিও প্রত্যক্ষভাবে সংযুক্ত ছিলেন নব শিল্পান্দোলনের সঙ্গে তথাপি তাঁর নিজের সাধনা-পদ্ধতি ছিল ভিন্ন। তাঁর অনুগামী বা শিষ্য বলে কেউ ছিল না। নন্দলাল অবনীন্দ্রনাথের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করলেও কোনদিন গুরুর পথে পা বাড়ান নি, অবনীন্দ্রনাথও চান নি নিজের ধরনধারন জোর করে শিষ্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে। অবনীন্দ্রনাথের সদা সতর্ক দৃষ্টি ছিল যাতে শিষ্যর নিজস্ব প্রতিভার উন্মেষে কোনো ব্যাঘাত না ঘটে। সেইজন্য নন্দলাল নিজেকে বলেছেন অবনীন্দ্রনাথের সৃষ্টি।

অনেকেরই ধারণা অবনীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলার পুনরুজ্জীবন ঘটিয়েছিলেন। এ ধারণা ভুল। ভারতীয় ক্ল্যাসিকাল চিত্রকলা—যার চূড়ান্ত বিকাশ ঘটেছিল অজন্তার দেওয়াল চিত্রে—সে সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথ বিশেষ আগ্রহী ছিলেন বলে মনে হয় না। তিনি নিজে কোনোদিন অজন্তায় যান নি। তাঁর ঝোঁক ছিল বরং মধ্যযুগীয় ক্ষুদ্রাকৃতি (মিনিয়েচর) চিত্রকলার প্রতি

মোগল চিত্রকলার অলঙ্করণ, রঙের মীড় এবং সূক্ষ্ম রেখা তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল কিন্তু মোগল ছবির বিষয়বৈচিত্র্যহীনতা তাঁর ভালো লাগে নি। তাঁর মানসিক গঠন ও দৃষ্টিভঙ্গি ছিল মোগল চিত্রকরদের থেকে স্বতন্ত্র। তিনি ছবিতে চাইতেন গল্প, নাটকীয়তা, কৌতুক রস ও গীতিময়তা। এই সবের মিলন ঘটেছিল তাঁর ছবিতে এবং সেজন্য তিনি ভিন্ন টেকনিক ( তাঁর নিজস্ব 'ওয়াশ' ) উদ্ভাবন করেছিলেন। তাঁর ছবিতে কেউ যদি গভীর ভাব খুঁজতে যান তাহলে বিফল হবেন কিন্তু তাই বলে তাঁর ছবি চটুল নয়।

পক্ষান্তরে মধ্যযুগের ক্ষুদ্রাকৃতি চিত্রকলা নন্দলালের হৃদয়ে সাড়া জাগাতে পারে নি। ১৯১০ সালে লেডী হেরিংহামের দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে তিনি যখন জনকয়েক সতীর্থের সঙ্গে অজন্তায় গিয়েছিলেন সেখানকার ছবি কপি করবার জন্য, তখন ভারতের ধ্রুব রীতির চিত্রকলার সঙ্গে তাঁর চাক্ষুষ পরিচয় ঘটেছিল। অজন্তা চিত্রের দ্রুত সাবলীল রেখা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। এক নম্বর গুহার আত্মসমাহিত বোধিসত্ত্বের রূপ তাঁকে অভিভূত করেছিল। অজন্তা থেকে ফিরে আসার পর তাঁর উপরে এই অজন্তার চিত্রকলার প্রভাব বহুদিন পর্যন্ত বর্তমান ছিল। আধুনিক ভারতে তিনিই একমাত্র শিল্পী যাঁর তুলিতে অজন্তা ছবির সাবলীল ছন্দময় রেখা ধরা দিয়েছে এবং সেদিক দিয়ে তাঁকেই ভারতীয় ক্ল্যাসিকাল চিত্রকলার উত্তরসাধক বলা যেতে পারে।

এ ছাড়া পৌরাণিক বিষয় অবলম্বনে ছবি আঁকায় তিনি যতখানি সার্থকতা অর্জন করেছেন এ রকম সাম্প্রতিককালে আর কেউ করেছেন কিনা সন্দেহ। এ বিষয়ে অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য লক্ষণীয়। অবনীন্দ্রনাথ দেব-দেবীর ছবি বড় আঁকেন নি তার কারণ তাঁর মেজাজের সঙ্গে এসব বিষয় খাপ খেত না। যে দু-এক ক্ষেত্রে এঁকেছেন সে সব ক্ষেত্রে ঘরের মানুষের মতো করেই এঁকেছেন ( তাঁর উমার ছবি স্মরণীয় )। অপর পক্ষে নন্দলাল আজীবন গভীর অধ্যাত্মবোধ দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন। সাধারণ হিন্দু ঘরের ধর্ম, বিশ্বাস, সংস্কার সব কিছুই তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন। হিন্দু ধর্মের দেব-দেবী, রামায়ণ-মহাভারতের বিভিন্ন চরিত্র সব কিছুই তাঁর কাছে বাস্তবের মতো প্রত্যক্ষ। শুধু বিশ্বাস বা সংস্কার নয় এদের মহিমা তিনি অন্তর দিয়ে অনুভব করতে চেষ্টা করেছেন এবং সেই অনুভূতিই ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর



ছবিতে। এদিক দিয়ে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য তাঁর শৈব-চিত্রগুলি। প্রাচীন ভারতে শিব ও উমার কল্পনা এক সময় শ্রেষ্ঠ শিল্পকলার জন্ম দিয়েছিল যার উদাহরণ মিলবে ইলোরা ও এলিফ্যান্টার ভাস্কর্যে এবং পরে দক্ষিণ ভারতীয় ব্রোঞ্জে। মধ্যযুগে শিব ও উমা তাঁদের মহিমা হারিয়ে ফেলে সাধারণ মানুষে পরিণত হয়েছিলেন এবং রাজপুত ও পাহাড়ী শিল্পীরা তাঁদের সেই ভাবেই চিত্রিত করেছিলেন। এই শিব ও উমারই সাক্ষাৎ মিলবে আমাদের ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যে। নন্দলাল শিব ও উমাকে আবার দেবত্বে উন্নীত করলেন, তাঁদের স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করলেন। তাঁর শিবের তাণ্ডবনৃত্য, বিষপানরত শিব, সতীদেহ স্কন্ধে শিব, হিমালয়ে শিব, শিবের মুখ প্রভৃতি ছবিতে শিবের যে নিরাসক্ত ধ্যানমগ্নরূপ ধরা পড়েছে তা প্রাচীন শৈব কল্পনারই নতুন প্রকাশ। তাঁর উমার ছবিগুলির মধ্যে প্রত্যাখ্যাত উমা, উমার তপস্যা প্রভৃতি ছবি ঐ একই আদর্শের বাহক।

শান্তিনিকেতনে আসার পর থেকে ( ১৯২৩ ) নন্দলালের শিল্পী জীবনের এক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এতদিন শুধু পৌরাণিক বিষয় নিয়েই ছবি আঁকতেন ( এর একদম ব্যতিক্রম ছিল না যে তা নয় ) এবার সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা অবলম্বনে ছবি আঁকতে শুরু করলেন। এদিক দিয়েও তিনি পথিকৃৎ। তাঁর আগে বৃহত্তর জনজীবনের সঙ্গে শিল্পের যোগ ছিল না। তিনিই সর্বপ্রথম সমাজের উপরতলা ছেড়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে নেমে এলেন। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রতিটি খুঁটিনাটি ধরা পড়েছে তাঁর তুলিতে। মা তার ছেলেকে কোলে করে নাচাচ্ছে; ছেলেরা কানামাছি খেলছে; গোপিনী তার দুধের ভাঁড় মাথায় করে নিয়ে লোকালয়ে বেচতে চলেছে; চাষী মাঠে লাঙ্গল চষছে; জেলে জাল বেঁধে নিয়ে মাছ ধরতে বেরিয়েছে; বাড়ির মেয়েরা ঢেঁকিতে পাড় দিচ্ছে; রাখাল ছেলে মোষের পিঠে চেপে বিকেলবেলা ঘরে ফিরছে; বুড়ো স্যাকরা নাকের ডগায় চশমা নামিয়ে ঠুকঠাক করে গয়না গড়ছে; কামার হাপর টানছে; বাউল একতারা হাতে করে নাচছে; মেলা থেকে লোকেরা ঘরে ফিরছে—এ রকম অসংখ্য পরিচিত দৃশ্য। বিশেষ করে সাঁওতাল জীবনের আনন্দ উৎসব বিষাদ তাঁর তুলিতে যে ভাবে ধরা পড়েছে তার তুলনা মেলে না। সাঁওতালদের বিয়ের শোভাযাত্রা বেরিয়েছে; বর কনেকে ঘাড়ে করে বাড়ি ফিরছে; সন্ধ্যেবেলা মাঠের কাজ শেষ করে সাঁওতাল মেয়েরা মাথায় ফুল গুঁজে গান গাইতে

গাইতে ঘরে ফিরছে ; চৈত্র সন্ধ্যায় একটি সাঁওতাল পুরুষ ঢোলক বাজাচ্ছে ও তার সঙ্গে তালে তালে কোমর জড়াজড়ি করে নাচছে তিনটি সাঁওতাল মেয়ে; বর্ষা সমাগমে একটি সাঁওতাল পরিবার ছুটে চলেছে বোলপুর স্টেশনের দিকে এবার তাদের কাজের সন্ধানে বাইরে বেরোতে হবে ; বহুদিন পরে ঘরে ফিরেছে সাঁওতাল পুরুষ, তার ঘরণী দুয়ারে দাঁড়িয়ে স্মিত হাস্যে তাকে অভ্যর্থনা করছে —এরকম অনেক ছোট ছোট ঘটনা তাঁর হাতে পড়ে অবিস্মরণীয় হয়ে গেছে। শুধু মানুষ নয় পশু-পাখিও তাঁর স্নেহ দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হয় নি। অনেকেরই ধারণা নন্দলালের দেব-দেবী বা পৌরাণিক বিষয়ের ছবি থেকে এ ছবিগুলি নিকৃষ্ট তার কারণ এগুলির উপকরণ স্থূল পার্থিব জীবন থেকে আহৃত। কিন্তু এ এক ধরনের গোঁড়ামী ছাড়া আর কিছু নয়। নন্দলাল নিজেই বলেছেন "এককালে দেব-দেবীর ছবিই বেশি এঁকেছি কিন্তু এখন সব কিছুই আঁকি, তার কারণ এখন সব কিছুর মধ্যেই তাঁর অস্তিত্ব অনুভব করি।" আসল কথা যে কল্পনাশক্তি থাকলে অতি তুচ্ছ বস্তুকেও অসাধারণে উন্নীত করা যায় সে কল্পনাশক্তি সবার থাকে না। নন্দলাল সেই বিরল কল্পনাশক্তির অধিকারী।

নন্দলালের বহুমুখী প্রতিভার এক বিস্ময়কর নিদর্শন তাঁর নিসর্গ চিত্রগুলি। এ বিষয়ে তিনি পথিকৃৎ না হলেও ( তাঁর আগে গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ নিসর্গ চিত্রে অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন ) তাঁর নিসর্গচিত্রগুলি এক স্বাতন্ত্র্যের ছাপ বহন করে। নন্দলাল প্রকৃতির মধ্যে এক প্রচণ্ড প্রাণস্পন্দন অনুভব করেছেন। বোলপুরের রুক্ষ প্রান্তর থেকে শুরু করে দার্জিলিঙে মেঘের খেলায়, তাগদার পাইন বনে, গোয়ালপাড়ার উত্তাল সমুদ্রে সর্বত্র তিনি এই প্রাণশক্তিরই বিচিত্র লীলা প্রত্যক্ষ করেছেন এবং নিজের প্রাণের সঙ্গে তার সাযুজ্য অনুভব করেছেন বলেই মায়াবতীর পথে এক বিপুল পাইন বৃক্ষকে একজন মানুষের সামান্য একটু অসতর্কতার জন্য পুড়ে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যেতে দেখে তাঁর অন্তর ব্যথায় মুচড়ে উঠেছিল। নন্দলাল প্রকৃতিকে দেখেছেন দূর থেকে নয়, কাছ থেকে, নিজেকে তার সঙ্গে মিশিয়ে ফেলে। এই জন্যই প্রকৃতির রহস্যগুলি উন্মোচন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলে নন্দলাল নিজেকে কখনও জাতীয় আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে রাখেন নি। যখনই তাঁর ডাক এসেছে তখনই তিনি



সে ডাকে সাড়া দিয়েছেন। একজন শিল্পী জাতীয় আন্দোলনকে যতখানি প্রেরণা যোগাতে পারে তিনি ততখানিই জুগিয়েছেন। জেলে রাজবন্দীদের মধ্যে তিনি পোস্টার বিতরণ করেছেন নিজে হাতে এঁকে। ১৯৩০ সালে লবন সত্যাগ্রহের পটভূমিকায় এঁকেছেন তাঁর বিখ্যাত ছবি গান্ধীজীর 'ডাণ্ডী মার্চ'। সঙ্কল্পের দৃঢ়তা গান্ধীজীর চোখেমুখে দেহের প্রতিটি পেশীতে পরিস্ফুট, তাঁর হস্তধৃত লাঠিটির মতোই তাঁর দেহ ঋজু, শুধু চিন্তাভারাক্রান্ত মুখ ঈষৎ আনত—তাঁর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে দেশের সর্ব স্তরের মানুষ। একটা জাতির অনমনীয় মনোভাবকে এমনভাবে রূপ দিতে আর কেউ পারেন নি। নন্দলালের উপর ছিল গান্ধীজীর গভীর শ্রদ্ধা তাই একাধিকবার কংগ্রেস প্যাণ্ডাল সজ্জিত করার জন্য তাঁর ডাক পড়েছে। শেষবার যখন তিনি হরিপুরায় কংগ্রেস প্যাণ্ডাল সজ্জিত করেন তখন মণ্ডপের চারিধার অলঙ্কৃত করেছিলেন ভারতীয় জনজীবন অবলম্বনে আঁকা অসংখ্য পটে। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের জীবন এতে ধরা পড়েছে। ছুতোর, কামার, কাঠুরে, শাঁখারী, ঢোলক বাদক, লাঠিয়াল, কুস্তীগির কেউই বাদ যায় নি। ভারতীয় জন-জীবনের সঙ্গে এই নিবিড় সংযোগ তাঁকে ভারতবর্ষে যথার্থ জাতীয় শিল্পীতে পরিণত করেছে।

প্রাচীন ভারতীয় প্রথায় দেওয়াল চিত্রের পুনঃপ্রবর্তন আধুনিককালে নন্দলালই সর্ব প্রথম করেন। শান্তিনিকেতনে চীনা-ভবনের গায়ে, পাঠ-ভবনের বারান্দায় এবং বরোদায় কীর্তি-মন্দিরের গায়ে তিনি যে দেওয়াল চিত্র এঁকেছেন তা তাঁর প্রতিভা বৈচিত্র্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। আগেই বলেছি মধ্যযুগের ক্ষুদ্রাকৃতি চিত্রকলা নন্দলালকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। তাঁর প্রতিভা মিনিয়েচার ছবির চাইতে দেওয়াল চিত্রের পক্ষেই অধিকতর উপযোগী। দেওয়াল চিত্রের সঙ্গে মিনিয়েচার ছবির পার্থক্য শুধু এই নয় যে একটি আকারে বড় ও অপরটি ছোট—একটির মধ্যে ক্রমানুস্থিতি ( continuity ) ও বেগ বর্তমান, অপরটি আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ। নন্দলালের বহু একক ছবির মধ্যে ( প্রত্যাখ্যাত উমা, নটীর পূজা, পঞ্চপাণ্ডবের মহাপ্রস্থান ইত্যাদি ) দেওয়াল চিত্রের এই গুণগুলি বর্তমান সেজন্য অনেকে মনে করেন নন্দলালের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ ঘটেছে দেওয়াল চিত্রে অথবা দেওয়াল চিত্র-ধর্মী চিত্রে। এরকম মনে করার কোনো সঙ্গত কারণ নেই তার কারণ দেওয়াল চিত্রের গুণ নেই অথচ মিনিয়েচার ছবি নয় এমন

অনেক ছবি নন্দলাল এঁকেছেন যা তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির পর্যায়ে পড়ে। আসল কথা নন্দলালের প্রতিভা একমুখী নয় বহুমুখী।

নন্দলালের বিপুল সৃষ্টি-সম্ভারের মধ্যে কোথাও পুনরাবৃত্তির ছাপ নেই। একই বিষয় নিয়ে হয়তো একাধিকবার এঁকেছেন কিন্তু প্রতিবারেই নতুন সৃষ্টি হয়েছে ( যেমন তাঁর শবী প্রতীক্ষা )। অফুরন্ত কল্পনাশক্তি এবং অন্বেষণ প্রবৃত্তি তাঁকে এক জায়গায় কোনোদিন স্থির হতে দেয় নি। ছবির উপকরণ ও টেকনিক নিয়ে তিনি নিরন্তর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন এবং সে পরীক্ষা-নিরীক্ষা তাঁর আজও শেষ হয় নি। ছবির আশ্রয় হিসাবে কখনও ব্যবহার করেছেন কাগজ, কখনও সিল্ক, কখনও পাটা, কখনও দেওয়াল আবার কখনও বা তামার পাত ( তাঁর তামার পাতের উপর তীক্ষ্ণাগ্র নরুণ দিয়ে আঁকা অজ্ঞাতবাসে অর্জুনের ছবিখানি স্মরণীয় )। আধুনিক কালে পট নিয়ে তিনিই প্রথম পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন। এ ছাড়া ছবির রঙের নির্বাচন এবং টেকনিক নিয়েও বহু পরীক্ষা করেছেন তিনি। তাঁর প্রথম দিকের ছবিগুলির বেশির ভাগই 'ওয়াশে' আঁকা কিন্তু শেষের দিকে টেম্পরাকেই তিনি তাঁর প্রতিভা বিকাশের উপযুক্ত মাধ্যম হিসাবে বেছে নেন। এর কারণ আছে। তাঁর প্রথম দিকের ছবিগুলি সাধারণত ফ্ল্যাট এবং এগুলির প্রাণরেখা যা ওয়াশে খুলতে কোনো বাধা নেই কিন্তু শেষের দিকের ছবিগুলি প্রধানত ছোপে আঁকা এবং এগুলির মধ্যে গভীরতার ইঙ্গিত আছে। টেম্পরায় যেমন গভীরতার ইঙ্গিত দেওয়া যায় ওয়াশে সেরকম দেওয়া যায় না। নন্দলাল অবশ্য রেখাভিত্তিক ছবি কোনোকালেই একেবারে বর্জন করেন নি যার প্রমাণ তাঁর 'দুর্গা' অথবা 'বিরহিনী রাধিকা'। এ ছাড়া শুধু মাত্র কালি তুলির ছোপে নন্দলাল বহু বিস্ময়কর ছবি এঁকেছেন, তার তুলনা মেলা ভার। এগুলি তাঁর শিল্প প্রতিভার আর এক উজ্জ্বল স্বাক্ষর।

নন্দলাল আধুনিক কিনা এ বিষয়ে অনেকে তর্ক তুলেছেন। প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছেন তাঁরাই যাঁরা তথাকথিত আধুনিকতার উগ্র সমর্থক। আধুনিকতার অর্থ যদি উৎকেন্দ্রিকতা হয় তাহলে নন্দলাল অবশ্য আধুনিক নন কিন্তু আধুনিকতার লক্ষণ যদি হয় 'নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভা' তাহলে নন্দলাল অবশ্যই আধুনিক। আধুনিকতার নামে পাশ্চাত্যে এবং তার দেখাদেখি আমাদের দেশে শিল্পের জগতে যে নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে



নন্দলাল মুক্ত কণ্ঠে তার নিন্দা করেছেন এবং বলেছেন প্রাচ্য শিল্পীর আদর্শ এ নয়। প্রাচ্য শিল্প কোনোদিনই প্রকৃতির দাসত্ব করে নি কাজেই প্রকৃতির শৃঙ্খল কেটে বেরিয়ে আসার তার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আসলে আধুনিকতা হচ্ছে একটা ফ্যাশান এবং এই ফ্যাশান শুধু যে শিল্পী-যশোপ্রার্থী অক্ষম তরুণদেরই আকৃষ্ট করেছে তা নয় অনেক স্থিতধী শিল্পীরও পদস্খলন ঘটিয়েছে। সুলভ বাহবা এবং নগদ পুরস্কারের লোভে এঁদের অনেকেই তাঁদের দীর্ঘদিনের সাধনা বিসর্জন দিয়ে 'আধুনিক' হয়ে গেছেন। এইসব বিপথগামী প্রতিভাদের মধ্যে নন্দলালের সতীর্থ ও শিষ্যও কেউ কেউ আছেন। এই 'আধুনিকতা'র ঢেউ নন্দলালকে যে স্পর্শ করতে পারেনি তার কারণ তাঁর স্ব-ধর্মে অর্থাৎ কিনা শিল্প-ধর্মে অবিচল নিষ্ঠা। নিন্দা প্রশংসার প্রতি উপেক্ষা দেখিয়ে এই মহৎ শিল্পী চিরদিন নিজের সৃষ্টিকর্মের মধ্যেই ডুবে আছেন।

সুনীল সেন

# জন স্ট্রাচি প্রসঙ্গে

জন স্ট্রাচি সম্পর্কে বড় কথা, তিনি কর্মে ও কথায় সমাজতান্ত্রিক। বিশ্বাসহীনতার এই যুগে সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁর গভীর বিশ্বাস শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। জগৎজোড়া পরিবর্তনের মুখে ধনতন্ত্রবাদের সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পথের সন্ধানে তাঁর গবেষণা বহুদূর প্রসারিত। এই গবেষণার ফল গণতান্ত্রিক সমাজবাদ। অধুনা এই মতবাদের নতুন শিষ্য দেশে-বিদেশে দুর্লভ নয়। মার্কসবাদের সঙ্গে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের পার্থক্য কোনো কোনো বিষয়ে মৌলিক ; মার্কস ও লেনিনের কয়েকটি মত তার কাছে ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে অগ্রাহ্য, কিন্তু মার্কসীয় পদ্ধতি অনুসরণে তাঁর আগ্রহ ও নিষ্ঠা সহজেই চোখে পড়ে। মার্কস ও লেনিনের তত্ত্ব বুঝবার ও বোঝাবার যে চেষ্টা তিনি করেছেন, নিষ্ঠাহীনতার এই যুগে তা আদৌ সুলভ নয়।

উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারে স্ট্রাচির জন্ম। ভারতের সঙ্গে স্ট্রাচি-পরিবারের সম্পর্ক পুরনো। প্রসিদ্ধ "স্ট্রাচি ভ্রাতৃদ্বয়"-এর কথা অনেকের মনে পড়বে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগের অনেক বুদ্ধিজীবীর মত তিনি মার্কসবাদের দিকে আকৃষ্ট হন এবং সহজেই কমিউনিস্ট মতবাদ গ্রহণ করেন। 'ক্ষমতার আসন্ন সংগ্রাম' ( The Coming Struggle for Power ) তাঁর এই সময়কার রচনা। উনত্রিশের মহাসঙ্কটে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা বিপর্যয়ের মুখে। ইতালি ও জার্মানিতে ফ্যাসিস্ট শক্তিগুলির যুদ্ধের বাজনা বেজে উঠেছে। স্পেনের গৃহযুদ্ধ আসন্ন। এই পটভূমিতে এসেছিল 'আসন্ন সংগ্রাম'-এর ডাক। হার্ভাডে বসে যুবক গলব্রেথ সে ডাক শুনেছিলেন। তাঁর মতে, এই শতাব্দীর সবচেয়ে প্রভাবশালী বইগুলির অন্যতম 'ক্ষমতার আসন্ন সংগ্রাম'। আমেরিকায় এই বই প্রায় লক্ষ কপি বিক্রি হয়েছিল। ভারতের মার্কসবাদী মহলেও এই বই সুপরিচিত। স্ট্রাচি তখন ষোল আনা কমিউনিস্ট। কয়েক বৎসর পরে তিনি তাঁর মতবাদ পরিবর্তন করতে শুরু করেন। ব্রিটিশ লেবর পার্টির একজন নেতা



হিসাবে আমরা তাঁকে দেখি ; কিছুকাল তিনি লেবর মন্ত্রিসভার সভ্য হয়েছিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে ধনতন্ত্রবাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাঁর গবেষণার ফল 'সমসাময়িক ধনতন্ত্রবাদ' ( Contemporary Capitalism, 1957 )। আমেরিকার "নিউ ডিল", রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান ভূমিকা, জনকল্যাণ-রাষ্ট্রের রূপ, সর্বজনীন ভোটাধিকার, ট্রেড ইউনিয়নের ব্যাপকতা, শ্রমিক শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান চেতনা ও শক্তি, স্ট্রাচির চিন্তাধারাকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছে বলে মনে হয়। অনেকে বলেন, তিনি কেইন্‌সের মতবাদে বিশ্বাসী। ইচ্ছামতো "কেইনসীয় তত্ত্বের" লেবেল এঁটে অনেক তত্ত্বের বিচার অপেক্ষাকৃত সহজ। স্ট্রাচি তাঁর লেখায় কেইন্‌স-এর যে সমালোচনা করেছেন, তা উক্ত তত্ত্বের শ্রেষ্ঠ সমালোচনাগুলির পর্যায়ে পড়ে। স্ট্রাচির অভিযোগ, কেইন্‌স মার্কস পড়েন নি। স্ট্রাচিকে কেইন্‌স-পন্থী বললে তাঁর উপর অবিচার করা হয়। 'সমসাময়িক ধনতন্ত্রবাদ'-এ স্ট্রাচি যে তত্ত্ব উপস্থিত করেছেন, তার সমালোচনা আরো ধৈর্য, নিষ্ঠা ও গবেষণার দাবি করে। পুরনো ছকে সমসাময়িক ধনতন্ত্রবাদের ব্যাখ্যা অধুনা অচল। সংকট প্রতিরোধে রাষ্ট্রের ভূমিকা ( "anti-crisis measures" ) এবং অস্থায়ী সাফল্য মার্কসবাদী মহলে বর্তমানে স্বীকৃত। মার্কসবাদ বাস্তবকে মেনে নেয়। আজকাল Government spending যে বহুল আলোচিত তা অস্বাভাবিক নয়। তবু মনে হয় স্ট্রাচি রাষ্ট্রযন্ত্রে, সংবাদপত্র-রেডিও-টেলিভিসনে একচেটিয়া গোষ্ঠীর বিপুল এবং ভয়ঙ্কর প্রভাবকে খাটো করে দেখেছেন। দুই দশক আগে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য সংগ্রামের যিনি ডাক দিয়েছিলেন, 'সমসাময়িক ধনতন্ত্রবাদ'-এ তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। স্ট্রাচি বুদ্ধিজীবী, নতুন তাঁকে সর্বদা আকর্ষণ করে। নতুন কিছু আবিষ্কারের চেষ্টায় বুদ্ধিজীবী অনেক সময় পরিপ্রেক্ষিত হারিয়ে ফেলেন। এক্ষেত্রে ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা কিছুটা প্রতিষেধকের কাজ বোধহয় করতে পারে।

স্ট্রাচি ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার আশ্রয় নিয়েছেন। 'সমসাময়িক ধনতন্ত্রবাদ' প্রকাশিত হবার দু বছর পরে আমরা পেলাম 'সাম্রাজ্যের শেষ' ( The End of Empire, 1959 )। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিকাশ, বিস্তার ও অবসান এই বইএর প্রধান আলোচ্য বিষয়। বইএর অনেকটা অংশ জুড়ে রয়েছে ভারতের কথা। ১৯৫৬ সালে তিনি ভারতে এসেছিলেন ; ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল

ইনষ্টিটিউটে তখন গলব্রেথের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। দুজনে কয়েক সপ্তাহ ধ
ভারত পরিক্রমা করেন। মৃত্যুর কয়েক মাস আগে তিনি ভারত ও পাকিস্তা
সফর করে যান।

ষ্ট্রাচির সব লেখাই সুখপাঠ্য, কিন্তু পেশাদারী ঐতিহাসিক না হয়ে
ইতিহাস লিখতে তিনি কত দক্ষ তার পরিচয় দেয় এই বই। ইতিহা
লিখবার এই নতুন ঢং, অর্থনৈতিক ইতিহাসের পটভূমিতে রাজনৈতি
ইতিহাস বোঝাবার চেষ্টা, পাঠককে আকৃষ্ট করে। যে পদ্ধতিতে ষ্ট্রা
অর্থনৈতিক তথ্য এবং সেই সঙ্গে Orme, Cromer, Milner Papers-এ
তথ্য ব্যবহার করেছেন তা অভিনব। মনে হয় সুগঠিত দৃষ্টিভঙ্গি থাকবা
ফলেই ষ্ট্রাচির এই পদ্ধতির অনুসরণ সার্থক। দৃষ্টিভঙ্গির অভাবে অনে
পাণ্ডিত্যপূর্ণ লেখা অনেক সময় বন্ধ্যা হয়ে যায়।

'সাম্রাজ্যের শেষ' শিরোনামা অনেকের পছন্দ না হতে পারে। আমা
মতে ষ্ট্রাচির সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা এবং ইতিহাসে বিশ্বাস সমগ্র বইতে স্প
প্রতিভাত। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের "পুনরুজ্জীবনশীল ভূমিকার" কথা তি
অবশ্যই বলেছেন, এবং এই প্রসঙ্গে তাঁর আশ্রয় মার্কসের প্রসিদ্ধ উক্তি
ব্রিটিশ শাসনের "ধ্বংসাত্মক ভূমিকা"—ক্লাইভের প্রবর্তিত "দস্যু রাষ্ট্র"
"ড্রেইন", ভারতবাসীর দারিদ্র্য, শাসকশ্রেণীর "লাস্থা ফেয়ার" নীতির অনুসর
ভারত-শোষণের ফলে মুষ্টিমেয় ব্রিটিশ "পরিবারের" (জনসংখ্যার শতক
মাত্র ১০ ভাগ) ধনদৌলত বৃদ্ধি তাঁর চোখে ধরা পড়েছে। তাঁর মতে ব্রিটি
শাসনের দ্বৈত ভূমিকা ছিল। বর্তমান যুগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্তমিত
তিনি মনে করেন না, ভারত, ব্রহ্ম, সিংহলের "আজাদী ঝুঠা"; ক্ষমতা
হস্তান্তরের ফলে ঐ সব দেশ রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করেছে। উপনিবেশ
গুলির স্বাধীনতা একালের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলির অন্যতম। ব্রিটেনে
পক্ষে ঔপনিবেশিক শাসন চালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল না। আফ্রিকা
কয়েকটি দেশে ঔপনিবেশিক শাসন বজায় রাখার তিনি বিরোধী। ব্রিটি
শ্রমিক শ্রেণীকে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, ঔপনিবেশিক শাসন বজায় রা
বর্তমানে "অলাভজনক"; "তেল সম্পদের লাভ" (oil profits) হারালে
ব্রিটিশ শ্রমিকশ্রেণীর জীবনধারণের মান নিম্নগামী হবার আশঙ্কা অমূলক
কেননা উপনিবেশে প্রতিরক্ষা খাতে ব্রিটেনকে বছরে যে টাকা খরচ করতে
হচ্ছে, তার পরিমাণ কম নয়। ইউনিয়ন জ্যাক গুটিয়ে ফেলতে উচ্চ মধ্যবি



শ্রেণীর, এমন কি শ্রমিক শ্রেণীর বক্ষ বিদীর্ণ হতে পারে, কিন্তু ঐ পতাকা উড্ডীন করবার পরিণতি 'সুয়েজ-এর' ঘটনা। সুয়েজ সম্ভাব্য ভবিষ্যতের নিশানা। সাম্রাজ্যের পর্ব শেষ—এই বাস্তবের মোকাবিলা ব্রিটিশ শ্রমিক-শ্রেণীকে করতে হবে, যদিও এর জন্য মানসিক প্রস্তুতি বেদনাদায়ক।

ইতিহাসে ষ্ট্রাচির আস্থা গভীর। মার্কসের প্রসিদ্ধ উক্তি তিনি উদ্ধৃত করেছেন: "মানুষ নিজের ইতিহাস নিজেই গড়ে।" ইতিহাস পড়া পণ্ডশ্রম, ইতিহাস থেকে আমরা এই শিখি যে ইতিহাস থেকে কিছু শেখা যায় না—কার্ল পপার এবং তাঁর অনুগামী ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের এই ধরনের বক্তব্যের উদ্দেশে ষ্ট্রাচি বলেন: বেশ কথা, এদের বই আমরা বন্ধ করব, এবং কখনই আর সেগুলো খুলব না। খোলা মন নিয়ে ষ্ট্রাচি ইতিহাস পড়েছেন এবং বার বার ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার আশ্রয় নিয়েছেন। ঘুমন্ত অবস্থায় হাঁটতে তিনি নারাজ।

ষ্ট্রাচির লেখার কেন্দ্রীয় বক্তব্য কি? "কমিউনিস্ট" ষ্ট্রাচির কেন্দ্রীয় বক্তব্য পরিষ্কার বোঝা যায়: রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের "আসন্ন সংগ্রামে" শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি ও ভবিষ্যৎ। কিন্তু "গণতান্ত্রিক সমাজবাদ" কি? কোন পথে এই লক্ষ্যে পৌছুনো যাবে? রাষ্ট্র ক্ষমতা কার হাতে থাকবে? যুগ পাল্টেছে এবং পাল্টাচ্ছে। সমসাময়িক ধনতন্ত্রবাদে পরিবর্তন ("mutation") এসেছে। উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ ভেঙ্গে পড়েছে। "গণতান্ত্রিক সমাজবাদ" বোঝাতে গিয়ে এই বিষয়গুলি তিনি উত্থাপন করেছেন, কিন্তু মনে হয় তাঁর মনে জিজ্ঞাসা শেষ হয় নি। তিনি জিজ্ঞাসার সূত্রপাত করেছিলেন।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ডাণ্ডি কেন্দ্রের প্রতিনিধিত্ব তিনি করেছিলেন। তাঁর শূন্য আসনে ডাণ্ডির শ্রমিক শ্রেণী আবার লেবর পার্টির প্রার্থীকেই নির্বাচিত করেছেন। তাঁর স্মৃতির প্রতি এই শ্রদ্ধাঞ্জলি সমাজতান্ত্রিকদের মনে ভরসা জোগাবে। জন স্ট্রাচি নিঃসন্দেহে একজন মহান সমাজতান্ত্রিক।

## পা ঠ ক গো ষ্ঠী

### মতান্তর বনাম মনান্তর

আমারই দুর্ভাগ্য, অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'পরিচয়' কিছু বিলম্বে আমার হাতে আসে। ফলে, 'পরিচয়'-এর বিশেষ সমালোচনা সংখ্যায় (শ্রাবণ, ১৩৭০) প্রকাশিত আমার "উপন্যাস: ভাষা ও চিন্তা" নামক সমালোচনা-প্রবন্ধ প্রসঙ্গে অগ্রহায়ণের 'পরিচয়ে'র পাঠকগোষ্ঠী বিভাগে পত্রস্থ শ্রীঅনিরুদ্ধ রায়ের আলোচনা এ-যাবৎ আমার চোখে পড়েনি। ইতিমধ্যে পৌষের 'পরিচয়' বেরিয়েছে! পৌষের 'পরিচয়'-এও আমাকে নিরুত্তর দেখে অনিরুদ্ধবাবু কী না জানি ভাবছেন।

'পরিচয়' কর্তৃপক্ষকেও আমি কিছু পরিমাণ দায়ী করি। প্রকাশের পূর্বে অনিরুদ্ধবাবুর পত্রবিষয়ে আমাকে অবহিত করা তাঁদের উচিত হত মনে হয়। 'পাঠকগোষ্ঠী'র আলোচনার এই এক অসুবিধা যে পাঠকের আলোচনা যখন প্রকাশিত হয় মূল রচনা ততদিনে সঙ্গত কারণেই সাধারণভাবে বিস্মৃত। সেক্ষেত্রে পাঠকের পত্র ও লেখকের উত্তরও যদি একই সঙ্গে প্রকাশের সুযোগ না থাকে তবে এ-জাতীয় আলোচনার সাধারণ আবেদন মূলতই ব্যর্থ হয়। তদুপরি, উভয় পক্ষেই কিছু ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ সর্বদাই থেকে যায়। এবং কখনো বা তার জের টেনে আপন যাথার্থ্য প্রমাণের আন্তরিক দুর্বলতায় 'পরিচয়'-এর আরো কিছু পৃষ্ঠা একই মতান্তরে আরো কিছুকাল ব্যয়িত হবার আশংকা বাড়ে বই কমে না। মতান্তর কখনো বা নিছকই মনান্তরের নামান্তর।

অবশ্য জগতের তাবৎ বিষয়ের ন্যায় 'পাঠক গোষ্ঠী'র আলোচনার উপরোক্ত অসুবিধাই আবার কখনো বা তার সুবিধারও কারণ বটে। মূল রচনা যেহেতু কিছু দুর্মরতার দাবী রাখে না (অন্তত আমার ক্ষেত্রে তো নয়ই), এবং আলোচনা প্রসঙ্গে মূল রচনার সম্পূর্ণ উদ্ধার যেহেতু অকল্পনীয় অবাস্তবতা, সেহেতু আলোচনাকারী পাঠকের পক্ষে মূল রচনার কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করা ভিন্ন উপায় থাকে না। এবং কে না জানে যে উদ্ধৃতির স্বভাব জলবৎ



তরল, যে-পাত্রে রাখা যায় সে-পাত্রের আকার ধারণ করাই তার অনিবার্য ধর্ম। আলোচনার এই সুবিধা, দেখা যায়, অনিরুদ্ধবাবু ভালোভাবেই বোঝেন। তাই আমার রচনার ভিন্ন ভিন্ন অংশে উক্ত কিছু উদ্ধৃতির সাহায্যে আমার বক্তব্যের পরস্পর-বিরোধিতা প্রমাণে তাঁর যে অকৃত্রিম উৎসাহ, কিংবা যে-নৈয়ায়িক প্রেরণা বশে ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তাবের ছিন্নভিন্ন গ্রন্থনায় তাঁর অনুপপত্তি সমূহ তিনি রচনা করেন, তার সমুচিত উত্তর বা যথাযোগ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া আমার পক্ষে সত্যিই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, এ-ক্ষেত্রে আমার পক্ষে সেই একই পুরাতন অসুবিধা যে আমার রচনার বিভিন্ন সামান্য প্রস্তাব ও প্রাসঙ্গিক সিদ্ধান্তসমূহ পুনরায় উদ্ধৃত করার প্রয়োজন হয়। অথচ একই কথা, অন্তত আংশিক ভাবেও, দু-বার লেখা নিতান্তই বিরক্তিকর। আমার বর্তমান পত্রের প্রত্যুত্তর দেবার প্রয়োজন হলে অনিরুদ্ধবাবু নিশ্চয় এ-কথা বুঝবেন।

ফলে, অনিরুদ্ধবাবু পত্রের বিস্তারিত আলোচনায় কোনো লাভ দেখি না। বিশেষত, সমালোচনা মুখ্যতই পরজীবী, পরোক্ষ রচনা। সমালোচনা লিখেও আমার বক্তব্য যদি প্রতিপন্ন না হয়ে থাকে, আলোচনাপত্রের উত্তর লিখেও যে তা সম্ভব হবে এমন আশা কম। উপরন্তু, আমার বক্তব্যের অসারতা প্রমাণে আমার দুর্বল যুক্তিজ্ঞান, ভ্রান্ত সমালোচনাবোধ, খণ্ডিত ঐতিহ্যচিন্তা এবং বাংলা ভাষার ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতা নিয়ে যে অকপট বিস্ময়, সরল ও সাবলীল মন্তব্য এবং "অহো!", "বেচারি যুগান্তরবাবু!" ইত্যাদি মুখভঙ্গির শব্দরূপ অনিরুদ্ধবাবুর পত্রে অহরহ দেখা যায়, তার পর আমার পক্ষে আর কীইবা বলার থাকে। এত সব কিছুর পরও, অনিরুদ্ধবাবুর পত্রে উত্থাপিত বিষয়মুখ বনাম আত্মমুখ সমালোচনার আদর্শ, ঐতিহ্যবোধ বনাম অতীতপ্রীতি, কিংবা বিশুদ্ধতা বনাম জীবনচর্যার ন্যায় নানাবিধ সাধারণ প্রসঙ্গে যদি আমার বলার কিছু থাকেও (বলার যে কিছু থাকে সে-কথা সবিনয়েই বলা যায়), অনিরুদ্ধবাবু তা শুনবেনই বা কেন। এবং এত সবকিছুর পরও আমার রচনার কোনো কোনো অংশ সম্পর্কে অন্তত কিছু ছদ্মবেশী প্রশস্তিও যে অনিরুদ্ধবাবু করেন সে তো অনিরুদ্ধবাবুরই অনিবার দয়া। এই ছদ্মবেশী প্রশস্তি আক্ষরিক অর্থে মেনে নিতে পারলেই আমার পক্ষে আপাতত তবু কিছু মুখরক্ষার সুযোগ থাকে। কাজেই অনিরুদ্ধবাবুর পত্রের উত্তরে তাঁর বক্তব্যের অসারতা প্রমাণে উপরোক্ত সরল মন্তব্যের

অনুরূপ কিছু-কিছু তাঁকেই ফিরিয়ে দেওয়া যেমন অর্থহীন, অনিরুদ্ধবাবুর বক্তব্য ও যুক্তিজ্ঞান সম্পর্কে ভাবগম্ভীর, সুচিন্তিত ইত্যাকার পিঠচাপড়ানির ছলনাও তেমনি অবান্তর।

কিছু প্রশ্ন কিন্তু তথাপি থেকে যায়। আমার সমালোচনা-প্রবন্ধের প্রথমার্ধের আলোচ্য ছিল শ্রীকমলকুমার মজুমদারের 'অন্তর্জলী যাত্রা'। 'অন্তর্জলীর যাত্রা'র আপেক্ষিক সিদ্ধি সম্পর্কে কিন্তু দেখা যায় আমরা উভয়েই শেষাবধি একমত। আলোচনার পথে, যদিও অনিরুদ্ধবাবুর ধারণা অনুযায়ী আমার সূচণার বিষয়মুখ প্রস্তাব পরিণামে স্বেচ্ছাচারী, এবং আমার অজ্ঞতাবশতই যদিও অনিরুদ্ধবাবু কথিত "ব্যঞ্জনা", "প্রসাদ", "শিল্পগুণ" ইত্যাদির চরম অবজেক্‌টিভ টেস্ট আমার অজানাই থেকে যায়, তথাপি কিন্তু এ অলৌকিক ঐক্য ঘটে যে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় আমরা উভয়েই একই সিদ্ধান্তে পৌছাই। তবে কি বুঝব, 'পরিচয়'এর সাড়ে সাত পৃষ্ঠাব্যাপী বদান্যতার সুযোগ নিয়ে অনিরুদ্ধবাবুর সমস্ত চিন্তা শুধুমাত্র ব্যক্তিগতভাবে আমার অসারতা প্রমাণের উদ্দেশ্যই ব্যয়িত হয়? কিন্তু তাতে কি লাভ, আমি বা অনিরুদ্ধ বাবু কেউই তো আপাতত আলোচ্য নই। এবং এই ক্ষুৎকাতর আক্রমণের পরও আমার লেখা পড়েই বা কী ভাবে "অ্যাংরি-হাংরিআলিস্ট" প্রসঙ্গটি অনিরুদ্ধবাবুর মনে আসে বোঝা কঠিন। লেখার পর নিজের চিঠিটি কি অনিরুদ্ধবাবু একবারও পড়ে দেখেন নি?

**যুগান্তর চক্রবর্তী**

অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত 'ভারতের আবদ্ধ আর্থনীতিক উন্নয়ন প্রসঙ্গে' (প্রিয়তোষ মৈত্রেয়ের) প্রবন্ধটি বিশেষ কৌতূহল উদ্রেক করেছে। বিশেষত এই ধরনের প্রবন্ধ অন্ধতা দূর করে এবং আত্মসমীক্ষার পথ খুলে দেয়। শহরের মানুষের মনের থেকে আড়াল সরিয়ে দিয়ে গ্রামের প্রতি অপেক্ষাকৃত সহানুভূতিশীল করে তোলে।

পৌষ সংখ্যা 'পরিচয়'-এ প্রকাশিত সৈকত মণ্ডলের চিঠিটিও একসঙ্গে বিশেষ ভাবনার অবদান যুগিয়েছে। কারণ আমরা শহরের মানুষ গ্রামের কথা সত্যিই তো চিন্তা করি না, এবং মনে করি এইটুকু দেশ। এই জড়তা



থেকে আমাদের মুক্ত হওয়ার সময় এসেছে, মুক্তবুদ্ধির প্রয়োজন আজ সর্বাধিক।

'পরিচয়'-এ আপনারা শিক্ষিত মানুষের কাছে এভাবে দেশের কথাটি তুলে ধরতে থাকুন।

**সন্ধ্যা সেন**

আমি 'পরিচয়' পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক ও শুভাকাঙ্খী। পত্রিকায় নিয়মিত বিদেশী গল্পের অনুবাদ পাঠ করতে চাই। কারণ এই দিকটা এখনও প্রায়-উপেক্ষিত। যদিও সাহিত্যরসিকদের কাছে এবং সাধারণ পাঠকদের কাছেও এর বিশেষ চাহিদা বর্তমান। আধুনিক ছোটগল্পের ক্ষেত্রে পৃথিবীব্যাপী যে নবজাগরণের সাড়া পড়ে গেছে, নতুন নতুন যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, তা আমাদের দেশের ইংরাজি অনভিজ্ঞরা (বেশির ভাগ পাঠকই) কি করে অনুসরণ করবে?

আর, তাছাড়া 'পরিচয়' নামের তাৎপর্যও তো তাই সাহিত্যের বিভিন্ন ঘাটের সঙ্গে সখ্য স্থাপন করিয়ে দেওয়া।

**জনৈক পাঠক**

## "নিগ্রো সমানাধিকারবাদীর গান" প্রসঙ্গে

"পীট সীগরের গলায় নিগ্রো সমানাধিকারবাদীর গান" প্রসঙ্গে আরও দু-একটি তথ্য নিবেদনের জন্য এই চিঠি। গানটির মূল ও অনুবাদ 'পরিচয়'-এর অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হওয়ার পর এই গানের দু-একটি ক্ষেত্রে পাঠান্তরের বিষয়টি আমি জানতে পারি। আমাদের দু-একজন বন্ধুও এ সম্পর্কে আমাকে জানান।

গানটির যে সাম্প্রতিকতম চেহারা আমরা পেয়েছি তা প্রথমে ছিল একটি নিগ্রো ধর্মসঙ্গীত। সেটির শুরু ছিল "I will overcome"—এইভাবে। তারই পরিবর্তিত রূপ "We shall overcome someday" আমেরিকার

নিগ্রোমুক্তি আন্দোলনের সঙ্গীত হিসেবে গৃহীত হয়ে যায়। আদিতে এ প্রাচীন গানটির বাণীতে বলে :

"আমি রইব ঠিক
রইব অনুরূপ তাঁর
ধরব মাথায় মুকুট
আমি করব জয়,…" ইত্যাদি

এই গানেরই পরিবর্তিত রূপ গত চতুর্থ দশকে আমেরিকার সুতাকল আর বাগিচা শ্রমিকদের খুবই প্রিয় হয়ে ওঠে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ দশকে তারই আবার পুনর্বিন্যস্ত বর্তমান আকারের গানটিই নিগ্রো মুক্তি অভিযাত্রীর গান।

পীট সীগরের সঙ্গীতানুষ্ঠানের টেপ-রেকর্ড আরও মিলিয়ে শুনে এই গানের একেবারে শেষাংশে "We shall end in peace, we shall end in peace"—এই পাঠান্তরটুকুও লক্ষ্য করলাম। সেজন্য আগের প্রকাশিত গানটির অনুবাদের শেষে এই পঙ্‌ক্তিটি :

"আমরা ফিরব শান্তিতে, শান্তিতে…
আমরা করব জয় সে-একদিন"

এই ভাবে রাখার আমি পক্ষপাতী।

সিদ্ধেশ্বর সেন

শ্রীযুগান্তর চক্রবর্তীর চিঠি প্রসঙ্গে দু-একটি কথা বলা দরকার। কোনো লেখা প্রসঙ্গে প্রাপ্ত চিঠি মূল লেখককে পূর্বাহ্নে দেখালে সুবিধা হয় সন্দেহ নেই, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে সময়াভাবে তা সম্ভব হয় না—এবং দেখানটা, প্রসঙ্গত, বাধ্যতামূলকও নয়। শ্রীঅনিরুদ্ধ রায় যদি শ্রীচক্রবর্তী সম্পর্কে ব্যক্তিগত কোনো অভিযোগ করতেন তাহলে প্রকাশের পূর্বে অবশ্যই তাঁর বক্তব্য জেনে নেওয়া হত। কিন্তু সাহিত্য বিষয়ে এবং এক বই সম্পর্কে দুজন সমালোচক কদাচিৎ একমত হন ধরে নিয়েই শ্রীরায়ের চিঠিটা আমরা পত্রস্থ করেছি শ্রীচক্রবর্তীকে না দেখিয়েই, যেমন শ্রীচক্রবর্তীর পত্রও প্রকাশ করা হল শ্রীরায়কে না দেখিয়েই। কিন্তু উভয়ক্ষেত্রেই প্রত্যুত্তর প্রকাশে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সাংবাদিকতার রীতি অনুসারে।

—সম্পাদক পরিচয়



## ফরাসী মণ্ডন-শিল্প

কলকাতায় এবারকার চিত্র-প্রদর্শনীর মরশুমে চিত্ররসিকমহলে সবচেয়ে সাড়া জাগিয়েছে ফরাসী রাষ্ট্রদূতাবাসের সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস্-এ অনুষ্ঠিত ফরাসী মণ্ডন-শিল্পের প্রদর্শনীটি। মোট ১৯২টি দ্রষ্টব্য নিয়ে এই প্রদর্শনী—যার সবগুলি দ্রষ্টব্য সামগ্রিক উপভোগের দিক থেকে তো বটেই, প্রায় প্রত্যেকটি দ্রষ্টব্য আলাদা ভাবেও দর্শকের চোখ আর মনকে অভিভূত করার মতো। বরং বলা যেতে পারে, এই প্রদর্শনীতে দর্শকের ইন্দ্রিয়ের পক্ষে একটু যেন অতিভোজনেরই আয়োজন ছিল, যে-কারণে বহু দর্শককেই একাধিকবার এই অতি-সমারোহময় শিল্প-সমাবেশে যেতে হয়েছে প্রতিবারে তার এক-একটি দিককে উপভোগ করার জন্যে : ট্যাপেষ্ট্রি, স্টেন্‌ড্ গ্লাস, পুঁথি-চিত্র ও ইলাস্‌ট্রেশন, দেওয়ালে টাঙানোর মতো ছবি, ধাতু-কারুশিল্প, মৃৎশিল্প ইত্যাদি। মণ্ডন-শিল্পের সমস্ত দিককেই এই প্রদর্শনীতে উপস্থিত করা হয়েছে এবং তা করা হয়েছে কত যত্নের সঙ্গে, দেশের এই সব সাংস্কৃতিক সম্পদগুলির প্রতি কী গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে।

১৯২টি দ্রষ্টব্যের মধ্যে ৫৪টি ট্যাপেষ্ট্রি : বিরাট আকারের কম্বলের ওপরে বোনা বিচিত্র সব বিষয়ের বর্ণসমারোহময় ছবি আর নক্‌শা—প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কালের লেজের, মাতিস, পিকাসো পর্যন্ত মহাশিল্পীদের আঁকা। প্রাচীন ট্যাপেষ্ট্রিগুলির বিষয়বস্তু তৎকালীন মানুষের—প্রধানত যারা ছিল ট্যাপেষ্ট্রি-শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষক, বিপ্লবপূর্ব ফরাসী সমাজের সেই উচ্চকোটির নরনারীর মসৃণ ও অলস—দৈনন্দিন জীবনের নানা দিক, পুরাণকাহিনী ইত্যাদি। কিন্তু বুনোনের কারুকার্যে, চিত্রিত বিষয়ের খুঁটিনাটি বর্ণনায়, রঙের আশ্চর্য নিপুণতায় এইসব দেওয়াল-জোড়া বিপুল আকারের নক্‌শী-কম্বলগুলি ভিত্তিচিত্রকে আর পেন্টিংকেও যেন হার মানায়। ফরাসী বিপ্লবের অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালে গল্প বলার চেয়ে প্যাটার্ন সৃষ্টি করার দিকে, বর্ণবিন্যস্ত একটি ছককে প্রাধান্য দেবার দিকে শিল্পীদের বেশি নজর। যেমন, মার্ক সাঁ-সাঁয়েজ-এর 'সূর্যের রথ' যাতে দেখি—ফরাসী বিপ্লবের পরে সর্বব্যাপী এক ব্যক্তিস্বাধীনতার খুব সচেতন উপলব্ধির ফলেই কিনা জানি না—ব্যক্তিগত স্টাইলের বিকাশ, প্রতীকের প্রাধান্য।

তারপরে বেশ কিছুকাল ধরে ফ্রান্সে—তথা ইওরোপে—ট্যাপেস্ট্রি শিল্পের চর্চা প্রায় বন্ধ হয়েছিল প্রধানত ধনী পৃষ্ঠপোষকের অভাবে। আধুনিক কালে আবার ফ্রান্সে নক্‌শী-কম্বল শিল্পের বিপুল প্রাণপরিপূর্ণতায় পুনরভ্যুদয় ঘটেছে এবং শ্রেষ্ঠ ফরাসী চিত্রকরদের মধ্যে অনেকেই কম্বলের ওপরে বুনে তোলার জন্যে ছবি আঁকায় উৎসাহিত হন। এই প্রদর্শনীতে দেখা গেল পিকাসোর রেখা-নির্ভর 'দুই ক্লাউন', লেজেরের অপূর্ব বর্ণাঢ্য 'দি গ্র্যাণ্ড প্যারেড', মাতিসের প্রতীক-চিহ্নিত প্যাটার্ন-প্রধান 'আকাশ' আর 'সমুদ্র', লুর্‌সাটের ত্রিমাত্রিক ডৌলে চিত্রিত 'অ্যামাজোনিয়া', আঁদ্রে বোর্দোরিয়ে-র পশম-সুতোয় আশ্চর্য কৃতিত্বের সঙ্গে বুনে তোলা ব্রাশ-ছোপের কাজ 'মার্সেল সাম্বা' ইত্যাদি।

স্টেন্‌ড্‌ গ্লাস বা জানলায় রঙীন কাঁচ সাজানো ছবির প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক যেসব নিদর্শন এই প্রদর্শনীতে উপস্থিত করা হয়েছে, তাও এই ট্যাপেস্ট্রিগুলির মতোই দর্শককে অভিভূত করে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে এই স্টেন্‌ড্‌ গ্লাস অলঙ্কৃত করত গীর্জা, চাপেল আর সামন্ত-প্রভুদের কাস্‌ল্‌গুলিকে। তাই তাতে ধর্মভাবের প্রবলতা, খ্রীষ্ট-জীবনের নানা কাহিনীর—প্রধানত নেটিভিটির আর ক্রুসিফিক্‌শনের প্রাধান্য। আধুনিক কালে সেই স্টেন্‌ড্‌ গ্লাস সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তুলছে ইণ্ডাস্ট্রির পরিবেশকে, কারখানা-শপের অফিস-ঘরের জানালায় সন্নিবিষ্ট হচ্ছে। তাই তাতে এসেছে হরেক নতুন নতুন মোটিফ, অ্যাব্‌স্ট্র্যাক্‌ট্‌ ল্যাণ্ডস্কেপ থেকে স্টিল লাইফ আর যন্ত্রযুগের প্রতীক-সমন্বয় পর্যন্ত সবকিছু। এক্ষেত্রেও অগ্রগণ্য ফরাসী শিল্পীরা যে উৎসাহী, তার অতি সুন্দর প্রমাণ মার্ক শাগাল-এর জেরুজালেম সিনাগগ-এর জানলাটি এবং ভিলঁ-র ক্রসবাহী খ্রীষ্টের বেশ কিছুটা অস্বাভাবিক পরিপ্রেক্ষিতে জটিল—কিন্তু অপূর্ব সুন্দর রঙের ছকে সাজানো—রচনাটি।

ইলাস্‌ট্রেশন বা পুঁথি-চিত্রগুলির মধ্যে আছে লুই আরাগঁ-এর বইয়ের জন্যে লেজের-অঙ্কিত চিত্র, নোবেল পুরস্কার-বিজয়ী কবি সেণ্ট জন পার্স-এর কবিতার ব্রাক্‌-অঙ্কিত চিত্ররূপ, ডন কুইক্‌জোট-এর জন্যে আঁকা সালভাডর ডালি-র ছবি, বদ্‌ল্যার-এর রচনার এডুয়ার গ্যর্গ-অঙ্কিত চিত্ররূপ এবং রুয়ন্ট, মাতিস, পিকাসো ও আরও অনেকের নানা ধরনের কল্পনামণ্ডিত ইলাস্‌ট্রেশন।

পেন্টিংগুলির মধ্যে বহু শ্রেষ্ঠ ফরাসী চিত্রকরের রচনা স্থান পেলেও ভান গগ, গোগ্যাঁ, রেনোয়া ও অন্যান্য ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীদের কোনো রচনা নেই



দেখে একটু হতাশ হয়েছি। মাতিসের 'ওড্যালিস্ক' এতদিন পুনর্মুদ্রণে দেখে দেখেই মুগ্ধ হয়েছি, এবারে এই সিরিজের একটি প্রতিনিধিস্থানীয় মূল রচনাকে চাক্ষুষ করার দুর্লভ সৌভাগ্য হল।

উত্রিল্লোর 'এ ভিউ অফ আঁজ্‌' মুগ্ধ বিস্ময়ে খুঁটিয়ে অনুশীলন করার মতো একটি ছবি: দর্শকের চোখের গতিকোণ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই ছবির রাস্তাটি জীবন্ত হয়ে উঠে প্রতিবার নতুন ভাবে মোড় নিচ্ছে—কী আশ্চর্য নিখুঁত পরিপ্রেক্ষিত এনেছেন শিল্পী এই ছবিটিতে! এসব ছবির মূল রূপ দেখতে পাওয়াটা সত্যিই ভাগ্যের কথা।

শিল্পের ক্ষেত্রে পিকাসোর প্রতিভা প্রায় সর্বত্রগামী: তাঁর মৃৎশিল্প-রচনাগুলি খুব নয়নশোভন না হলেও, অভিনব। ধাতুশিল্পে ও অন্যান্য কারুশিল্পে আমাদের ভারতীয় শিল্পীদের কাজ এত উন্নত মানের, যে তার পাশে এই ফরাসী নিদর্শনগুলি ম্লান হয়ে পড়ে। ষোড়শ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ শতাব্দীর এই সব ফরাসী কারুশিল্পের নমুনাগুলি সমকালীন ভারতীয় কারুশিল্পের পাশে শিল্পসুষমা ও কারিগরী দক্ষতার দিক থেকে দাঁড়াতেই পারে না।

## গণতান্ত্রিক জার্মানির গ্র্যাফিক শিল্প

আমাদের দেশে ও অন্যান্য দেশেও—চিত্ররসিক মহলে জার্মান শিল্প যে স্বল্পজ্ঞাত, সে কথা বললে বোধহয় ভুল হবে না। এর কারণ: একদিকে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য শিল্পে, তথা বিশ্বশিল্পে, প্যারিসের প্রচণ্ড মর্যাদা—যার ফলে অন্যান্য ইওরোপীয় দেশের আধুনিক চিত্রকলা সম্পর্কে আমাদের আগ্রহ স্তিমিত। অন্যদিকে, হিটলার-নাৎসীবাদের অভ্যুত্থানের ফলে জার্মানির বিচ্ছিন্নতা, জাতিবৈর, সাহিত্য-সিনেমা-চিত্রকলায় জার্মান ঐতিহ্যের ছেদ আর এক ধরনের একপেশে উগ্রতার বিকাশ—যার ফলে তার প্রতি অন্যান্য দেশের বুদ্ধিজীবী-বিদগ্ধজনের স্বাভাবিক বীতস্পৃহা।

হিটলারের আমলে সাময়িক বিকার ও অধঃপতন ঘটলেও, জার্মান শিল্পের ('জার্মানিক' শিল্প বললে বোধহয় আরো ভালো হয়) পূর্বাপর গথিক ঐতিহ্যের এক বিপুল সম্পদ-সম্ভার রয়েছে। এই সম্পদ ফরাসী শিল্পের ল্যাটিন ঐতিহ্যের সমৃদ্ধির চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। বলা বাহুল্য, ইওরোপীয় শিল্পের এই দুই ধারাই ইটালীয় রেনেসাঁস-এর এক অভিন্ন উৎস থেকে পুষ্টি আহরণ করেছে।

গ্র্যাফিক শিল্পে—বিশেষত এন্‌গ্রেভিং-এ—এক অত্যন্ত প্রবল প্রাণপূর্ণ ধারা জার্মানিতে দীর্ঘকাল ধরে অব্যাহত রয়েছে। স্কোন্‌গাউয়ের, ক্রানাখ, গ্রুনেওয়াল্ড প্রভৃতি হলেন এর শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ। এঁদের সকলের, বিশেষত গ্রুনেওয়াল্ডের, রচনায় আমরা দেখি অসামান্য রেখার চারুতা, নিখুঁত ড্রয়িং, বিষয়-নির্বাচনে সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের সংগ্রামময় দৈনন্দিনতা এবং বিষয়-চিত্রণে অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠ ভাবালুতা-বর্জিত বলিষ্ঠ মানবতা। এই ধারারই একজন আধুনিক পথিকৃৎ হলেন ক্য থে কোল্‌ভিৎস—যিনি জার্মান জনগণের, শ্রমিক কৃষক মেহনতী মানুষের ক্রোধ আর প্রতিবাদকে, স্বপ্ন আর সংগ্রামকে চিত্রিত করে গেছেন হিটলারের উদ্যত বন্দুকের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে।

স্থানীয় চারুকলা-ভবনে সম্প্রতি পূর্ব জার্মানির পাঁচ জন সমকালীন শিল্পীর ৬৫টি গ্র্যাফিক রচনার একটি সুন্দর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের বাণিজ্য-প্রতিনিধি-দপ্তর। এই পাঁচজন শিল্পীর রচনা-শৈলী, মেজাজ ও দৃষ্টিভঙ্গী বিভিন্ন। কিন্তু বস্তুনিষ্ঠা, রচনা দক্ষতা আর শিল্পক্ষমতা প্রত্যেকেরই অসাধারণ। প্রধানত লিথোগ্রাফ, এচিং আর চারকোল ড্রয়িং দিয়ে সাজানো এই প্রদর্শনীর প্রত্যেকটি প্রিণ্টই আশ্চর্য নিখুঁত। আর, প্রত্যেকের রচনাতে দেশের প্রতি, দেশের মানুষের প্রতি, গভীর ভালবাসার পরিচয়: বন্দর, কারখানা, শহর-গ্রামের পথ-ঘাট, সমুদ্রতীর। দৈনন্দিন কর্মজীবনের ও গোষ্ঠীজীবনের পটভূমিকায় শ্রমিক, খামারের মেয়ে, মা ও ছেলে, শিশুর দল, সাধারণ মানুষ। যুদ্ধের বিরুদ্ধে, পারমাণবিক মৃত্যুর বিরুদ্ধে তাদের সাগ্রাম।

যুদ্ধ ধ্বংস আর মৃত্যুর বিরুদ্ধে জাগ্রত গণশক্তির চিত্রণে লেআ গ্রুন্‌ডিগের চিত্রমালার প্রচণ্ড তীব্রতা মনকে আচ্ছন্ন করে। ষোড়শ শতাব্দীর জার্মান কৃষক-বিদ্রোহ নিয়েও গ্রুন্‌ডিগ-রচিত অনেকগুলি অতি তীক্ষ্ণ ও প্রচণ্ড আবেদনশীল এচিং এই প্রদর্শনীতে ছিল। ওই একই বিষয় নিয়ে রচিত কোলভিৎস-এর লিথোগ্রাফ-চিত্রমালার কতকগুলি প্রিণ্ট দেখার সুযোগ আমাদের ইতিপূর্বে হয়েছে। কোলভিৎসের গণজীবনাশ্রয়ী সেই সংগ্রামী ধারার আরেকজন সার্থক শিল্পী হলেন মার্গারেট হাউএস্লের—যাঁর নাৎসীদের ইহুদী-নির্যাতনের ছবিটি ('পোগ্রম') বহুক্ষণ দর্শকমনকে অভিভূত করে রাখে।



হার্বার্ট টুখোল্‌স্কি-র রচনায় ('ট্রলার', 'বল্‌টিক সমুদ্র তীর') যেমন একটি শান্ত ও মগ্ন শিল্পীমনের পরিচয় পাই, তেমনি হান্‌স্‌-থিও রিথ্‌টেরের রচনায় ('আয়নার সামনে মেয়েটি', 'মা ও ছেলের কথোপকথন') দেখি এক ধরনের অস্থির অনুসন্ধান। ক্রিৎস ডায়েন বিষয়বস্তুর অংশবিশেষের ডিটেল বর্ণনার মধ্যে দিয়ে অত্যন্ত জোরালো ভাবে প্রকাশ করেছেন সমগ্র বিষয়টিকে। 'খনি-শ্রমিকের জিনিসপত্র' লিথোটিতে প্রতীকীকরণের এক অতি সুন্দর রীতিকে তিনি কাজে লাগিয়েছেন।

## এম. পি. রাও

সম্প্রতি চারুকলা ভবনে শ্রী এম. পি. রাও তাঁর আঁকা ৩৫টি ছবির এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন। শ্রীরাও স্বয়ংশিক্ষিত শিল্পী। পেশায় তিনি দুর্গাপুর স্টীল প্ল্যাণ্টের একজন কারুবিজ্ঞানী। অবসর সময়ে ছবি আঁকা তাঁর নেশা। আমাদের দেশে ছবি আঁকার 'হবি' খুব বেশি লোকের নেই। বাংলা দেশে চাকুরীজীবীরা অনেকে অবসর সময়ে গান-বাজনার চর্চা করেন এবং মোটামুটি সকলেই অভিনেতা। ছবি আঁকার নেশা—বিশেষত ক্যান্‌ভাসের ওপর তেল-রঙে আঁকা ছবি—বেশ ব্যয়সাপেক্ষ বলেই হয়তো অপেশাদারদের মধ্যে বিরল। তাছাড়া স্কুল-কলেজে রীতিমতো শিল্পশিক্ষার অভাবে চিত্রচর্চার প্রতি আমাদের শিক্ষিত সাধারণের টান অপেক্ষাকৃত কম—যদিও আগ্রহের কিছুমাত্র অভাব নেই। সেদিক থেকেই শ্রীরাও-এর ছবিগুলির প্রতি আমরা বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়েছি।

শ্রীরাও-এর কাছ থেকে জানা গেল, তিনি মাত্র বছর তিনেক হল রীতিমত ছবি আঁকা শুরু করেছেন এবং তাঁর প্রাথমিক শিল্প শিক্ষার মেয়াদ বিদেশের একটি নৈশ ক্লাসে মাত্র দু-তিন সপ্তাহ। কিন্তু সাধারণভাবে তাঁর রচনায় মোটামুটি এমন একটি দক্ষতার পরিচয় আছে যে তাঁর সহজাত শিল্প-প্রবণতাকে স্বীকার করে নিতে দ্বিধা হয় না। অধিকাংশই তেল-রঙের কাজ এবং এগুলির ড্রয়িং পরিপ্রেক্ষিত ও কম্পোজিশন মোটেই কাঁচা নয়। উজ্জ্বল রঙের ব্যবহারেও শিল্পীর উৎসুক মনের পরিচয় ফুটেছে। বিষয়বস্তুর মধ্যে প্রকৃতি, মানুষ, কল-কারখানা, জীবজন্তু আর বিমূর্ত ফর্ম ইত্যাদি সব কিছুর সমাবেশ।

কিন্তু স্টাইল ও টেকনিক-এর ক্ষেত্রে শ্রীরাও এখনও হাতড়ে বেড়াচ্ছেন। তাঁর নিজস্ব রীতিপদ্ধতি, দৃষ্টিভঙ্গী ও স্বধর্ম এখনও তাঁর রচনায় দৃঢ়মূল হয় নি। প্রায় প্রত্যেকটি রচনা শৈলী ও ভঙ্গীর দিক থেকে অপরগুলি থেকে আলাদা। মানুষের মুখগুলি কোনোটি অ্যাকাডেমিক, কোনোটি প্রিমিটিভিস্ট ধরনে আঁকা, কোনোটি বা কিউবিস্ট প্যাটার্নে ভাঙা এবং কোনোটিতেই ব্যক্তি-চরিত্রের পরিচয় ফোটেনি। কতকগুলি ছবিতে সংযত মোলায়েম রঙ বেশ আকর্ষণীয় হলেও, অধিকাংশ ছবিতেই রঙ এতো বেশি চড়া এবং টোন-এর বৈপরীত্য এতো উগ্র যে দর্শকের চোখ কিছুক্ষণের মধ্যেই পীড়া বোধ করতে থাকে।

তবে এসব ত্রুটির ওপরে বেশি জোর দেওয়া উচিত নয়। কারণ, মাত্র তিন বছর আগে ছবি আঁকা শুরু করার পর, এইটেই তাঁর প্রথম প্রদর্শনী। সবচেয়ে বড়ো কথা: তিনি বাস্তববাদী শিল্পী। তাঁর রচনায় যে স্বভাবজাত শিল্পী মনের ও বস্তুনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া গেল, তাতে তাঁর কাছ থেকে নিজস্ব বিশিষ্টতায় উজ্জ্বল ও আরও স্বধর্মনিষ্ঠ রচনা পাবার ভরসা রাখব।

## অসিতকুমার হালদার

গত ১৩ই ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রবীণ শিল্পী অসিতকুমার হালদারের ৭৩ বছর বয়সে মৃত্যু হয়েছে। নব্য ভারতীয় চিত্রকলার প্রতিষ্ঠায় ও প্রসারে যাঁদের দান অবিস্মরণীয়, অসিতকুমার ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তাঁর মৃত্যুতে আমরা আধুনিক ভারতীয় শিল্পের অগ্রগণ্য একজন পথিকৃৎকে হারালাম। কলকাতার সরকারী কলা-বিদ্যালয়ে অবনীন্দ্রনাথ প্রথম যে শিষ্যদল নিয়ে আমাদের নব্য শিল্পান্দোলন শুরু করেন, তাঁদের মধ্যে নন্দলালের সহযোগী হিসেবে ছিলেন অসিতকুমার।

বালক বয়সেই তাঁর শিল্পশিক্ষায় হাতে খড়ি হয় গ্রামবাংলার পটুয়া-কুমোরদের কাছে, কৃষ্ণনগরের মৃৎশিল্পীদের কাছে। সরকারী আর্ট স্কুলের শিক্ষাশেষে তিনি দীর্ঘকাল শান্তিনিকেতন-কলাভবনের অধ্যক্ষতা করেন। তারপর তিনি ইওরোপে যান এবং সেখান থেকে ফিরে আসার পর প্রথমে জয়পুরে ও পরে লক্ষ্ণৌতে সরকারী আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষের পদে দীর্ঘকাল অধিষ্ঠিত থাকেন।

অসিতকুমারের একটি খুব বড়ো কাজ হল লেডী হেরিংহ্যামের উদ্যোগে অজন্তা-চিত্রাবলীর প্রতিলিপি অঙ্কণ। এ কাজে তাঁর অন্যতম সহযোগী ছিলেন নন্দলাল। সরকারী প্রত্নবিভাগের উদ্যোগে তিনি বাগ ও যোগীমারা গুহারও অনেকগুলি ভিত্তিচিত্রের প্রতিলিপি অঙ্কণ করেছিলেন। অসিতকুমারের স্মরণীয় শিল্পসৃষ্টিগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ইংরেজী গীতাঞ্জলির জন্যে আঁকা কতকগুলি ছবি এবং বুদ্ধজীবনী-চিত্রমালা। দেশের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অবলম্বনে তাঁর আঁকা অনেকগুলি সুন্দর ছবি আছে। অসামান্য রেখার চারুতা ও স্নিগ্ধ রঙের সুষমা তাঁর বহু রচনায় এক ধরনের শান্ত মধুর আত্মমগ্নতা সঞ্চারিত করেছে।

১৯৩৪ সালে ভারতীয় চিত্রকরদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটি অফ আর্টস্-এর সদস্য নির্বাচিত হন। ভারতের চারুশিল্প, কারুশিল্প ও শিল্প-ইতিহাস সম্পর্কে অসিতকুমারের লেখা অনেকগুলি মূল্যবান ইংরেজি ও বাংলা বই আছে। তিনি কতকগুলি কাব্যগ্রন্থ ও নাটকেরও রচয়িতা।

রবীন্দ্র মজুমদার

# স ং স্কৃ তি - স ং বা দ

## কলকাতায় লোক-সংস্কৃতি সম্মেলন

কাব্যের জন্মবৃত্তান্ত পরিক্রমা প্রসঙ্গে একদা সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বলেছিলেন, কাব্য কবির পূর্বপুরুষ। কবিতার প্রাথমিক প্রকাশ ও সমগ্র সংস্কৃতির আদিমতম আবির্ভাব কোনো ব্যক্তিমানসের প্রয়াসে নয়, সামাজিক ঐক্যের সম্বন্ধপাতের সচলতায় লোকজীবনের অন্তরভাষ্যে। সমস্ত সংস্কৃতির উৎস হিসাবে লোক-সংস্কৃতি অনুধাবন ও চর্চার ইতিহাস সাম্প্রতিক। প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের দেশে সবেমাত্র তার সূত্রপাত। এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশে প্রথম সর্ব-ভারতীয় লোকসংস্কৃতি সম্মেলন সংগঠিত করার জন্য লোকসংস্কৃতি পিপাসু-মাত্রেই উদ্যোক্তাদের অকুণ্ঠ সাধুবাদ জানাবেন।

প্রসঙ্গত স্মর্তব্য বাংলাদেশে প্রথম হলেও সর্বভারতীয় ভিত্তিতে এটি প্রথম সম্মেলন নয়। ইতিপূর্বে ১৯৫৮ সালে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তর সভাপতিত্বে এলাহাবাদে, ১৯৫৯ সালে ওয়াই. বি. চওয়ান-এর সভাপতিত্বে বোম্বাইতে এবং ১৯৬১ সালে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য-র সভাপতিত্বে উজ্জয়িনীতে সর্বভারতীয় লোকসংস্কৃতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক গোলযোগ ও বহুবিধ অসুবিধার জন্য কয়েকবার দিন পরিবর্তনের পর অবশেষে সম্প্রতি দক্ষিণ কলকাতার সিংহী পার্কে তিনদিনব্যাপী লোকসংস্কৃতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান সভানেত্রী ছিলেন শ্রীমতী সোফিয়া ওয়াদিয়া এবং অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন।

সম্মেলনের প্রধান আকর্ষণ ছিল লোকসাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক বিবিধ আলোচনা-চক্র। অত্যন্ত দুঃখের কথা সম্মেলন কর্তৃপক্ষ পূর্ব ঘোষণানুসারে সব কয়টি আলোচনা-চক্র সংগঠিত করতে পারেন নি। সাহিত্য, সঙ্গীত ও সাধারণ অধিবেশনে বিভিন্ন বিষয়ে রচনা পাঠ ও আলোচনা করেন—সর্বশ্রী রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, মিরোস্লাভ প্রোকো পেক, এল. পি. বিদ্যার্থী, কুঞ্জবিহারী দাস, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কমল কোঠারী, বি. রামা রাজু, এস. মিশ্র, ভবগ্রাহী মিশ্র, রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি। বাংলার লোকসাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনায় কোনো প্রতিনিধিত্বপূর্ণ আলোচক ছিলেন না। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় বাংলার লোকসাহিত্যে ঐতিহাসিক উপাদান বিষয়ক

প্রবন্ধে জনৈক বক্তা বাংলার মঙ্গল কাব্যের সমাজচিত্রগুলি আলোচনা করেন
লোকসাহিত্য অধিবেশনে এইরূপ প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্তির যৌক্তিকতা প্রসঙ্গে
ব্যক্তিগতভাবে ডঃ কুঞ্জবিহারী দাস ( উড়িষ্যা ) ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞরা জিজ্ঞাস
উত্থাপন করেন। প্রসঙ্গত প্রবন্ধ নির্বাচন কমিটির সভাপতি হিসাবে—
ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং সদস্যবৃন্দের মধ্যে ডঃ সুশীলকুমার দে
প্রিয়রঞ্জন সেন, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত প্রভৃতির নাম উল্লিখিত থাকায় সকলে
বিস্ময় প্রকাশ করেন। অবশ্য অনেকেই এই ধারণা পোষণ করেন যে
প্রবন্ধগুলি যথাযথরূপে উক্ত কমিটির মাধ্যমে অধিবেশনে উপস্থাপিত হয় নি
যাহোক বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে বাংলার লোকসাহিত্য-সংস্কৃতি
সম্পর্কিত কোনো সার্থক প্রবন্ধ পঠিত না হওয়ায় প্রায় সকলেই দুঃ
প্রকাশ করেন।

সম্মেলন প্রাঙ্গনে বাংলার লোকশিল্পের ও লোকশিল্প-সাহিত্য সম্পর্কি
পুস্তকের এক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা উদ্যোক্তারা করেছিলেন। গুণগত ও সংখ্যাগ
উপস্থাপনায় প্রদর্শনীটি অত্যন্ত দুর্বল। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যান্বিত হতে হ
পুস্তক প্রদর্শনীর মধ্যে ডঃ সুকুমার সেনের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থখা
দেখে। সাহিত্যের ইতিহাস হিসাবে গ্রন্থখানির যে মূল্যই থাক আলো
প্রদর্শনীতে গ্রন্থখানির অন্তর্ভুক্তি প্রসঙ্গে স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে
প্রদর্শনীতে বাংলার রূপকথা, ছড়া, গীতিকা প্রভৃতির সঙ্কলন এবং রবীন্দ্রনা
ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুশীলকুমার দে, আশুতোষ ভট্টাচার্য, শরৎচ
মিত্র, গোপাল হালদার, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বিনয় ঘোষ, প্রভৃতির লো
সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থগুলি প্রদর্শিত হওয়া উচিত ছিল।

সম্মেলনের তিনদিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা অনেক দর্শককে আক
করেছে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত এই সাংস্কৃতিক অধিবেশনের উল্লেখযো
অনুষ্ঠান হেমাঙ্গ বিশ্বাস ও সম্প্রদায়ের "লোকসংগীত," সোদপুর বা
নাট্য সমাজ পরিচালিত বর্ধমানের সোদপুর গ্রামের সংস্কৃতি দলের "রণপানৃত্য
ও "লোকগীত", টিন প্রেনটিস দম্পতির "আমেরিকান লোকসংগীত", পশ্চিম
সরকারের লোকসংস্কৃতি শাখা প্রযোজিত "মহুয়া" নৃত্যনাট্য, মলয় গীতবীথি
"সবুজ সোনা" নৃত্যনাট্য ও সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের "মৃচ্ছকটিক" নাট্যাভি
প্রভৃতি।

সম্মেলন উদ্যোক্তাদের পূর্বপ্রচার অনুসারে ধারণা হয়েছিল পৃথিবীর বি



দেশের লোকসংস্কৃতিবিদরা সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন কিন্তু সে বিষয়ে আমাদের হতাশ হতে হয়েছে। বর্তমানে ভারতে নৃতাত্ত্বিক গবেষণার জন্য অবস্থানকারী একমাত্র চেকোস্লোভেকিয়ার মিরোস্লাভ প্রোকোপেকের সম্মেলনে উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য। পঞ্জাব, উড়িষ্যা, রাজস্থান, অন্ধ্র, বিহার, মহারাষ্ট্র প্রভৃতির প্রতিনিধিরা সম্মেলনে যোগদান করলেও সারা ভারত সম্মেলনে অন্যান্য অংশের প্রতিনিধিত্ব অনিবার্য ছিল। সর্বোপরি যেহেতু বর্তমান সম্মেলন বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হল তাই বিভিন্ন আলোচনা-চক্র ও অধিবেশন—সর্বশ্রী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস নাগ, ও. সি. গাঙ্গুলি, নীহাররঞ্জন রায়, হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলকুমার বসু, আশুতোষ ভট্টাচার্য, সুশীলকুমার দে, বিনয় ঘোষ প্রভৃতি বাংলার লোকসংস্কৃতিবিদ ও গবেষকদের মননচর্চা ও সক্রিয়তায় জীবন্ত হয়ে উঠবে এইরূপ প্রত্যাশাই সম্মেলন সমাগতদের ছিল। এ আশা পূরণের ব্যর্থতার দায়িত্ব যারই হোক লোকসংস্কৃতি পিপাসুদের কাছে ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখের। সমস্ত সঙ্কীর্ণতার উর্ধ্বে উদ্যোগের তৎপরতা, নিষ্ঠা ও সততায় অদ্বৈত সম্পর্ক স্থাপন করে, প্রকৃত লোকসংস্কৃতিপ্রেমে পূর্ণ-সার্থকতাসন্ধানী হবে এই বিশ্বাস নিয়েই জিজ্ঞাসু মনস্ক লোকসংস্কৃতি পিপাসু-চিত্ত ভবিষ্যতের জন্য প্রতীক্ষা করবে।

তুষার চট্টোপাধ্যায়

আগামী বৈশাখ সংখ্যা

# পরিচয়

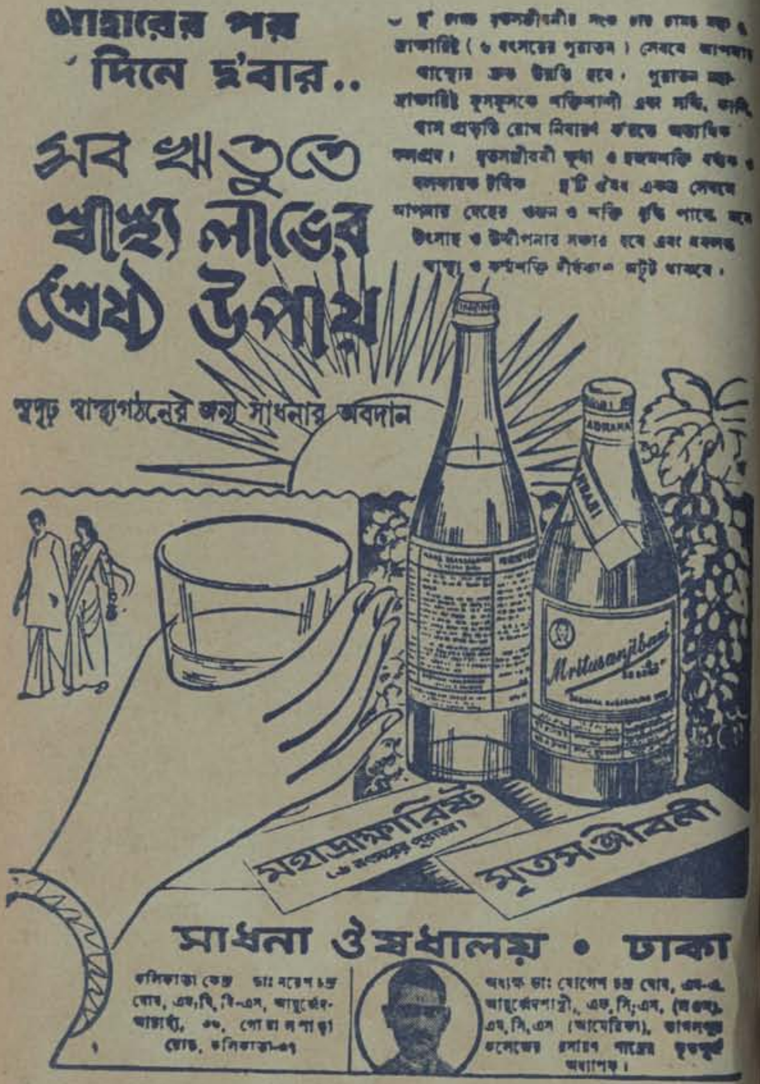
মহাকবি শেক্সপীয়রের চতুর্থ জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ সংখ্যারূপে প্রকাশিত হবে। বাংলাদেশের বিশিষ্ট সুধীবৃন্দ এই সংখ্যায় শেক্সপীয়রের কবিকর্মের সম্যক পর্যালোচনা করবেন এবং তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন। বিস্তারিত বিবরণ আগামী সংখ্যায় বিজ্ঞাপিত হবে।

এজেন্টদের কাছে অনুরোধ তাঁরা যেন আগেই তাঁদের বর্ধিত চাহিদা জানান।

তালিকাভুক্ত গ্রাহকদের এই সংখ্যাটির জন্য কোন অতিরিক্ত মূল্য দিতে হবে না।

**গ্রাহক চাঁদা**

বার্ষিক : ১০ টাকা  ষান্মাসিক : ৫.৫০ ন.প.


আহারের পর
দিনে দু'বার..
সব ঋতুতে
স্বাস্থ্য লাভের
শ্রেষ্ঠ উপায়
সুপুষ্ট স্বাস্থ্যগঠনের জন্য সাধনার অবদান
মহাদ্রাক্ষারিষ্ট
মৃতসঞ্জীবনী
Mritusanjibani
সাধনা ঔষধালয় • ঢাকা



১৩৭০


পরিচয়